কবিতাসংগ্রহ

২

কবিতাসংগ্রহ

২

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক

র রায়চৌধুরী



নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৪০০, ১৪ এপ্রিল ১৯৯৩

প্রকাশক : শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার,
নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৬৮ কলেজ স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : শ্রীবরুণচন্দ্র মজুমদার, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা. লি.
৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যাণীয়াসু

ভূমিকা

'যত দূরেই যাই' (১৯৬২ খ্রি) থেকে 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২ খ্রি) পর্যন্ত এক দশকের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে প্রকাশিত হলো 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সংগ্রহ'র দ্বিতীয় খণ্ড। দীর্ঘ বিরতির পর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিরূপে প্রত্যাবর্তনে আধুনিক কবিতার পাঠককুল খুশি হয়েছিলেন। নানা কারণে এই দশকটি কবির জীবনে তো বটেই, জাতীয় জীবনেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। চীন-ভারত সীমানা লড়াই, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভাগ হওয়া, নকশাল আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং আরো নানা ঘটনায় কবির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করি বিভিন্ন কবিতায়। কবিতা লেখার ধরনও বদলে যাচ্ছে— স্লোগানধর্মিতা ছেড়ে কবি বেছে নিচ্ছেন গল্প বলা বা কথোপকথনের রীতি।

কিন্তু কবির অন্তর্বর্তীকালীন নীরবতায় অনেকেই শঙ্কিত হয়েছিলেন। 'কালের পুতুল' গ্রন্থের নাম প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু উদ্বেগের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন :

> সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়—এ-দু'জনের মধ্যে কোনোদিনই কোনো মিল নেই—কিন্তু সম্প্রতি এই একটি শোকাবহ সাদৃশ্য ধরা পড়ছে যে দু'জনেই কবিতা লেখা বন্ধ করেছেন। তবু সুধীন্দ্রনাথের তিনখানা কবিতার বই আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী হবে, কিন্তু ঐ একটুখানি 'পদাতিক' হাতে ক'রে সুভাষ কি মহাকালের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন?
>
> ('কালের পুতুল' ১ম সং, পৃ ৭২-৭৩)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন কবিতা লেখা বন্ধ করেছিলেন, তখন তাঁকে রাজনৈতিক কর্মীরূপে নানা ভূমিকায় দেখি। কখনও তিনি ব্যস্ত খিদিরপুর ডকমজুর ইউনিয়নে, কখনও বা ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘে অথবা 'স্বাধীনতা' দপ্তরে। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বজবজে ছিলেন 'বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন'-এর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে। এখানকার অভিজ্ঞতা তাঁকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে, একথা কবি নিজেই লিখেছেন।

তাঁর না-লেখা পর্বের কিছুটা স্মৃতিচারণ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'চিঠির দর্পণ'-এ :

মাঝেমধ্যে লিখি নি তা নয়। যেমন, আটচল্লিশে প্রথম দফায় জেল থেকে বেরিয়ে। 'স্বাধীনতা' তখন বন্ধ। অজিত রায়ের উৎসাহে তখন ছোট আকারে দৈনিক একটা ক'রে কাগজ বেরোচ্ছে আর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাগজের জন্যে আমাদের তখন টাকার খুব দরকার। আমাদের ম্যানেজার তখন শচীন সেন। ঠিক হয়, আমার কবিতা নিয়ে ছোট একটা বই বার করা হবে। সেটা বিক্রি ক'রে কিছুটা টাকা তোলা হবে। এই ভাবেই বার হয়েছিল 'অগ্নিকোণ'। রেল ধর্মঘটের তখন তোড়জোড় চলছে। হাওয়া বেশ গরম হয়ে উঠেছে। পুজোর পরে পরেই আবার ধরা প'ড়ে গেলাম।

তখন লেখা নয়

জেলে গিয়ে লেখালেখির কোনো ব্যাপারই ছিল না। বাইরে ভেতরে সমানভাবে তখন লড়াই করার কথা। কিছুদিনের মধ্যেই দমদম সেন্ট্রাল জেল বিনা বিচারের আর বিচারাধীন বন্দীতে উপ্‌চে পড়ল।

কিছু অনুবাদ আর অনশনের ধর্মঘটের গান ছাড়া জেলে ব'সে কিছুই আর লেখা হয়নি। পড়বারও কি তেমন সময় পেয়েছি? দুবেলা কেবল এ-মিটিং সে-মিটিং, ছুতোয় নাতায় জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদবিসম্বাদ, বিচারাধীন বন্দীদের নিয়ে এ-প্ল্যান সে-প্ল্যান আর থেকে থেকে অনশন ধর্মঘট।

সশস্ত্র সংগ্রাম আর মুক্ত অঞ্চলের স্বপ্নে আমরা তখন মশগুল। বিপ্লবটা জেনে নেওয়ার পরই লেখাপড়ার ব্যাপারগুলো আসবে! বিপ্লবের আগে সংস্কৃতি নয়। ঘোড়ার আগে গাড়ি নয়।

('চিঠির দর্পণে', পাণ্ডুলিপিতে পৃ ১৯৭)

কবিতার জগতে ফিরে আসবার পর আর কখনও কবিতা লেখায় ছেদ পড়েনি। বস্তুত 'কবিতাসংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ডের কালসীমা হ'লো পুরো এক দশক এবং এই সময়ে তাঁর কবিতার বইয়ের সংখ্যা পাঁচ। এই সচলতার ধারা এখনও পর্যন্ত অব্যাহত।

আসলে কবি ও কর্মীর মধ্যে যে কোনো বিরোধ নেই সেটা তিনি জেলে থাকার সময়ে ক্রমশ উপলব্ধি করছিলেন। লোথার লুৎসে ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে প্রসঙ্গত তিনি বলেন :

আমি যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিই তখনও ঠিক এই ভাবে প্রশ্নটা এসেছিল যে আমি লেখক থাকবো না কর্মী হবো। আমি এই সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম যে না, আমি লেখক থাকবো না, আমি কর্মীই হবো। কিন্তু পার্টির কাজ করতে করতে এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে, পার্টিতে লেখার কাজটাই আমি ভালো করতে পারি এবং সে কাজটারও একটা দাম আছে। এটা আমি বলছি, যখন আমি লেখা বেশ

কয়েক বছর ছেড়ে দিয়ে আমি যখন জেলে যাই, জেলখানায় আমাকে বহু কমরেড বলেছে 'কেন আপনি লেখেন না? আমরা আপনার লেখা প'ড়ে আন্দোলনে এসেছি অথচ আপনি লেখেন না। আপনার লেখা উচিত।'

+

প্রথম খণ্ডে জানিয়েছিলাম যে, কোনো নতুন পৃষ্ঠায় নতুন স্তবক শুরু হ'লো তা নির্দেশের জন্য প্রথম শব্দটি ইন্‌ডেন্ট করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ৭৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই রীতি অনুসৃত। পরে কবির ইচ্ছানুসারে পুরো স্তবকটিই ডানদিকে সরিয়ে দিয়েছি।

সম্পাদনাকর্মটিই পরনির্ভর। পুস্তক-অনুরাগী এবং গ্রন্থাগার ছাড়া এই কাজ করা অসম্ভব। আমার সৌভাগ্য যে এরকম কিছু ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সহায়তা আমি পেয়েছি। দিব্য মুখোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী নানাভাবে সাহায্য করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারও আমি ব্যবহার করেছি। আরও যাঁদের কাছে আমার ঋণ, তাঁরা হলেন অরিজিৎ কুমার, তরুণ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, পিনাকেশ সরকার, প্রবীরকুমার রায়চৌধুরী, সুবীর ভট্টাচার্য, গুণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ মণ্ডল। প্রেসকর্মীদের আরও একবার অভিনন্দন এবং সেই সঙ্গে তাঁদের কর্ণধারদের। বারবার বিরক্ত করবার জন্য মাঝে মাঝে মৃদু ভর্ৎসনা করলেও প্রুফ দেখা থেকে তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

তরুণ সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আলোকচিত্র দুটি প্রতিমা ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত। প্রথম ছবিটি তাঁরই তোলা।

+

এই বইয়ের কবিতার অংশ ছাপা হ'য়ে যাবার পর আমি 'দিন আসবে'-র প্রথম সংস্করণের সন্ধান পাই। ফলে কাব্যগ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক বিন্যাস কিঞ্চিৎ ব্যাহত হয়েছে। 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাসংগ্রহ'-র দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হওয়া উচিত ছিল 'দিন আসবে' দিয়ে। বিশদ বিবরণের জন্য 'গ্রন্থপরিচয়' দ্রষ্টব্য।

সুবীর রায়চৌধুরী

কলকাতা
মার্চ, ১৯৯৩

সূচী

দিন আসবে (১৯৬১)

যত দূরেই যাই (১৯৬২)

কাল মধুমাস (১৯৬৬)

এই ভাই (১৯৭১)

ছেলে গেছে বনে (১৯৭২)

চিত্রসূচি

দিন আসবে

বছর দুই আগে আমি মস্কোতে একদিন মাদাম বীকোভার বাড়িতে গিয়েছিলাম। মাদাম বীকোভা প্রাচ্যতত্ত্ব সংস্থায় বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করেন। বাংলা বলেনও চমৎকার। তাঁর স্বামী বুলগারী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। কথায় কথায় আমি নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। ভাপ্‌ৎসারভের নাম করতেই দেখলাম তাঁর চোখেমুখে ভারি উৎসাহ ফুটে উঠল। বইয়ের তাক থেকে তক্ষুনি টেনে বার করলেন ভাপ্‌ৎসারভের কবিতার বই। তারপর মূল বুলগারী ভাষায় একটার পর একটা কবিতা পড়ে গেলেন। না বুঝলেও বেশ লাগছিল শুনতে। আমাদের সঙ্গে ছিল বারিস্‌। বারিসও ভালো বাংলা জানে। দু-একটা কবিতা অনুবাদ করতে বলায় মাদাম বীকোভার স্বামী রুশ প্রতিশব্দ বসিয়ে বসিয়ে খুব সাদামাঠাভাবেও যা বললেন, বারিস্‌ আমাকে তার বাংলা ক'রে শোনাল। শুনে একটু অবাক হলাম। ইংরিজি অনুবাদে যে সব জায়গা খুব জ'লো লেগেছিল, বারিসের মুখে শুনে সে জায়গাগুলো অনেক বেশি সুন্দর লাগল। মাদাম বীকোভার স্বামীকে আমি জিজ্ঞেস করলাম— আচ্ছা, রুশ অনুবাদে ভাপ্‌ৎসারভ কি আপনি পড়েছেন? উনি বললেন পড়েন নি। ব'লেই রুশভাষায় লেখা একটা বই টেনে বার ক'রে বললেন, প'ড়ে দেখা যাক তো। তারপর দেখি পড়তে পড়তে নিজের মনেই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করছেন। শেষ পর্যন্ত বইটা সরিয়ে রেখে বললেন—কিচ্ছুই হয়নি। কবিতার না ধরতে পেরেছে মানে, না ফোটাতে পেরেছে রস।

বুলগার থেকে হয়েছে ইংরিজি। আর আমি? সেই ইংরিজির করেছি অনুবাদ। কথায় বলে, সাত নকলে আসল খাস্তা। কাজেই এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কোনো কবিতা কিংবা কোনো কবিতার একাংশও যদি পাঠকের ভালো লাগে, তাহলেও অনুবাদক হিসেবে আমি খানিকটা সান্ত্বনা পাব। সত্যি বলতে কি, নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভের জীবনই আমাকে তাঁর কবিতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ভাপ্‌ৎসারভের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে এই :

পিরিন পাহাড়ের সানুদেশে ছোট্ট শহর বানস্‌কো। সেখানে ১৯০৯ সালে নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভের জন্ম। সেকালের তুলনায় নিকোলার মা এলেনা ভালোই লেখাপড়া

জানতেন। লোক-সাহিত্যে আর দেশবিদেশের কবিতা-চর্চায় তাঁর হাতেখড়ি মা-র কাছ থেকে। ছেলেবেলা থেকেই নিকোলা ছিলেন খুব মিশুক প্রকৃতির। আর সেই সঙ্গে ছিল তাঁর বই পড়ার নেশা। ইস্কুলে পড়তে পড়তেই সহপাঠীদের নিয়ে থিয়েটার করা, দল গড়া—এসব বিষয়ে নিকোলার ছিল খুব উৎসাহ। যখন তিনি নৌ-মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন থেকেই জাহাজীদের সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট ভাবধারায় আকৃষ্ট হন। গোপনে বইপত্র পড়েন। একবার নিকটপ্রাচ্যে যান মালজাহাজে। তারপর পাস ক'রে বেরিয়ে গ্রামাঞ্চলে এক কার্ডবোর্ডের কারখানায় প্রথমে করতেন স্টকারের কাজ, পরে হন মেশিনচালক। নাটক, গান, সাহিত্যপাঠ, বক্তৃতা—এইসব ক'রে শ্রমিকদের তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করতেন। এই সময় শ্রমিক পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে কারখানার লোকজনদের মধ্যে তিনি সে সময়কার প্রগতিশীল পত্রপত্রিকার প্রচলন করেন। তারপর ১৯৩৬ সালে কারখানা থেকে ছাঁটাই হয়ে নিকোলা চলে আসেন সোফিয়ায়। বহু কষ্টে প্রথমে এক কারখানায়,পরে রেলে কাজ পেলেন আগওয়ালার। তারও পরে তাঁর কাজ জোটে সরকারি কশাইখানায় যন্ত্রকুশলী হিসেবে। যখন যেখানেই কাজ করেছেন, তাঁকে খাটতে হয়েছে শরীরের রক্ত জল ক'রে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সমানে লিখেছেন। পড়াশুনো ক'রে কলমকে আরও ধারালো করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পার্টি থেকে নিকোলার ওপর পিরিন অঞ্চলে প্রচার অভিযান সংগঠিত করার ভার পড়ে। ধরা প'ড়ে নিকোলাকে সাজা খাটতে হয়। এরপর প্রতিরোধ আন্দোলনে নিকোলা হন অন্যতম নেতা। বুলগারিয়ার তখনকার ফ্যাশিস্ট সরকার তাঁকে ধরতে পেরে অকথ্য নির্যাতন করে। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে টলাতে পারে নি। ১৯৪২ সালের ২৩শে জুলাই মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে হাসিমুখে তিনি ফাঁসিতে প্রাণ দেন।

নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভ লিখেছেন সংগ্রামের কবিতা—যা তাঁর জীবন থেকে উঠেছে। তাঁর কবিতায় তাই নীরক্ত পাণ্ডুরতা নেই, প্রগল্‌ভ চিৎকার নেই। আছে যন্ত্রণার কথা, ভালবাসার কথা। আছে দাঁতে দাঁত দিয়ে সংগ্রামের কথা। আছে মানুষের অনিবার্য জয়ের কথা। অফুরন্ত আশার কথা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যাবার আগে

ঘুমুলে তোমাকে দেব মাঝে মাঝে
হঠাৎ দেখা।
দিও না দরজা। বাইরে রেখো না
আমাকে একা।

আঁধারে তোমাকে নীরবে দেখব
নয়ন ভ'রে।
বিদায়ের আগে এঁকে দেব চুমো
দুই অধরে।।

কারখানা

নীচে কারখানা।
আকাশে মেঘের মতো ধোঁয়া।
লোকগুলো সাদাসিধে
একঘেয়ে বেয়াড়া জীবন।
মুখোশ পড়েছে খসে,
রং গেছে চটে—
জীবনকে মনে হয়
যেন দাঁত-খিঁচোনো কুকুর।

কিছুতে ছেড়ো না হাল, লেগে থাকো—
নেই দম ফেলবার সময়।
লোম খাড়া ক'রে আছে
ক্রুদ্ধ জানোয়ার—
দাঁত থেকে তার
তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে হবে।

চাকায় জড়ানো বেল্ট ঠাস্ ঠাস্ শব্দ করে,
ক্যাঁচর কোঁচর শব্দে
মাথার ওপরে শ্যাফ্ট্ ঘোরে।
বন্ধ ঘরে খেলে না বাতাস,

বুক ভ'রে
মেলে না নিশ্বাস।

বাইরে তাকিয়ে দেখ,
বসন্তের হাওয়া
দোলায় মাঠের ধান,
হাতছানি দিয়ে ডাকে রোদ,
আকাশে হেলান দিয়ে গাছ
ছায়া ফেলে
কারখানা-প্রাচীরে।

অনাদরে দূরে ঠেলা
আদিগন্ত মাঠ—
কোনোদিন কি ছিল চেনা?
মনেও পড়ে না।
আকাশ নিক্ষিপ্ত হল আঁস্তাকুড়ে,
স্বপ্ন ছিল—
তাও।
কেননা তোমার চোখ
যন্ত্রে থাকবে আঁটা,
মন উড়ু-উড়ু হলে মুহূর্তের ভুলে
হাত যাবে উড়ে।

চিৎকারে ডোবাতে যদি পারো
যন্ত্রের ঘর্ঘর শব্দ,
যদি তুমি তুলতে পারো গলা
মেশিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে—
তাহলে শোনাতে পারো কথা।
তারস্বরে আমার চিৎকার
সেই কবে থেকে—
অনাদি অনন্তকাল ধ'রে।....

কারখানা,
কলকব্জা

এবং দূরের ঐ
অন্ধকার ঘুপ্‌চির মানুষ—
শুনেছি সবাই নাকি সমস্বরে করেছে চিৎকার।
এ চিৎকারে তৈরি হওয়া ইস্পাতের পাতে
আমাদের হাতে
কঠিন দুর্ভেদ্য বর্মে আবৃত জীবন।
এই যজ্ঞে একবার বাধা দিয়ে দেখ—
আগুনে নিজের হাত নিজেই পোড়াবে।

হে কারখানা!
আমাদের চোখ বুঝি বেঁধে দিতে চাও
ধোঁয়া আর ঝুলকালি দিয়ে?
বৃথা চেষ্টা!
কারণ, তোমারই কাছে
শিখেছি সংগ্রাম করতে।
আমরাই এ মাটিতে
ডেকে এনে বসাব সূর্যকে।

খেটে খেটে কত লোক হাড় কালি ক'রে
তোমার শাসনে জ্বলে পোড়ে;
সহস্র বক্ষের হৃদ্‌স্পদনে তবুও
দেখি তালে তাল দেয়
তোমার হৃদয়॥

ছবিঘর

দরজায় ভিড় খুব,
আলো প'ড়ে
দেয়ালে জ্বলজ্বল করছে পোস্টার।
হরফগুলো
বড় গলায় বুক ফুলিয়ে বলছে:
'এস, দেখ মানুষের জীবননাট্য'।
দরজায় ভিড় খুব।
আর আমার হাতের চেটোয়

ঘেমে নেয়ে উঠেছে
নিকেলের ওপর ছাপা রাজার মুখ।

অন্ধকার হলে
সাদা চৌকশ পর্দায়
ঘুম ঘুম চোখে হাই তোলে
মেট্রোগোল্ডউইনের সিংহ।
তারপর দুম ক'রে একটা রাস্তা,
রাস্তার দুপাশে জঙ্গল
আর মাথার ওপর যত দূর দেখা যায়,
নীল তকতকে আকাশ।

রাস্তার ঠিক বাঁকের মুখে
কলিশন হয়
চিকন চিকন দুটি গাড়িতে।
একটিতে আমাদের নায়ক
আরেকটিতে নায়িকা।
ভদ্রলোক
তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে নেমে
কাঠ-কাঠ হাতে
ভদ্রমহিলাকে যন্ত্রবৎ কোলে তুলে নেন।
ধোঁয়া-ধোঁয়া দৃষ্টিতে
ভদ্রমহিলা আস্তে আস্তে চোখ মেলেন,
চোখের পাতাদুটো থর থর ক'রে কাঁপে।
তারপর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে।
হায় হায়!
রূপ যেন সারা অঙ্গে ফেটে বেরোচ্ছে।

গাছের ডালে ব'সে
কোকিলের গান থাকতেই হবে,
পাতার ফাঁক দিয়ে
চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়বে নিথর নীলিমা,
আর কাছেই কোমল তৃণশয্যা
থেকে থেকে চোখ টিপে ডাকবে।

তেল-চকচকে জন্
গ্রেটার মুখে চক্ চক্ ক'রে চুমো খেল।
তার কামুক ঠোঁটে ফুটে উঠল
লোলুপ লালসা।....

ব্যস্, ব্যস—
খেল্ খতম্ করো, থামো
এর কোন জায়গায় আমাদের জীবন?
কোথায় নাটক?
আমি এর কোন জায়গাটায় আছি বলো
আমার মেরুদণ্ডে গুলিভরা বন্দুকের নল ছুঁইয়ে রেখেছে
বিস্ফোরক সময়।

আমাদের বুকের ভেতরটা ধোঁয়ায় ভর্তি,
আমাদের ফুসফুসে যক্ষ্মা—
প্রেমেই পড়ি
আর বিপদেই পড়ি
গোবরগণেশ হওয়া আমাদের কুষ্ঠিতে লেখে নি।

আমরা কি চিকন গাড়িতে ক'রে যাই
মনের মানুষের সঙ্গে
মিলতে?

আকণ্ঠ ধোঁয়ার মধ্যে
ঝুলকালি মেখে
যন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে
যখন আমরা কাজ করি—
আমাদের জীবনে
ভালবাসা তখনই জাগে।

তারপর আসে বিবর্ণ জীবন,
টিঁকে থাকার জন্যে সংগ্রাম,
ভাসাভাসা অস্পষ্ট স্বপ্ন—
রোজ রাত্রে ছেঁড়া মাদুরে একপাশে একহাত হয়ে শুয়ে

নিজের অজ্ঞান্তে
আস্তে আস্তে বিছানার সঙ্গে মিশে যাই
তারপর মরি।

জীবনের এই হল চেহারা।
নাটক যা
তা এরই মধ্যে।
আর যা কিছুই বলো—
সব মিথ্যে।।

বাড়ি তুলব

গেঁথে তুলব আমরা এক ইমারত, প্রকাণ্ড বিশাল একটা বাড়ি।
বাড়ির দেয়াল হবে কংক্রিটের।
ইস্পাতের কড়িকাঠে তৈরি হবে বাড়ির কাঠামো।
আমরা যারা সাধারণ লোক
মেয়ে ও পুরুষ হাত ধরাধরি ক'রে
গড়ে তুলব বাড়ি—
মহানন্দে বাসা বাঁধবে সেখানে জীবন।

থাকি আমরা দম-বন্ধ করা
খোলার বস্তিতে।
আমাদের ছেলেপুলেগুলো
দেখতে পায় না রোদ্দুরের মুখ,
অকালে হারায় প্রাণ বিষাক্ত হাওয়ায় শ্বাস টেনে।
এ পৃথিবী বন্দীশালা।
ক্ষেতে-কলে কাজ-করা
হে আমার দেশের মানুষ,
থামো! আর কিছুতেই নয়।
এসো আমরা গড়ি সেই বাড়ি—
জীবন যেখানে বাঁধবে বাসা।

আমাদের ছেলেপুলেগুলো
অন্ধকার ঘরে

দুর্গন্ধে নিশ্বাস আটকে মরে।
আর আমরা কী নির্লজ্জ! কিছুই বলি না—
নিষ্ঠুর ক্লীবত্বে থাকি বুকে হাঁটু গুঁজে।
বিদ্যুৎকে তারে বেঁধে কে পাঠালো?
সেও তো আমরাই—
আমাদের রক্ত সেই তার বেয়ে
জীবনে জোগায় শক্তি। জীবনই আবার
আমাদের ঠেলে ফেলে! হেঁচড়ে হেঁচড়ে নিয়ে যায় টেনে—
আমরা বোবার মতো শুধু চেয়ে থাকি।
পাথরে বিঁধিয়ে নখ— গ্রানিট্ পাথরে
আমরা সুড়ঙ্গ খুঁজি পাহাড়ের গায়ে।
আমরা ঘিরেছি সারা পৃথিবীকে ইস্পাতের রেলে,
আমরা রাখি পৃথিবীর পেটের খবর
ভূগর্ভের গুপ্তধন আমাদের জানা।
আকাশের গায়ে এরিয়ালে
ফুটে আছে রেখাচিত্র
শূন্যে স্কাইস্ক্রেপারের চূড়া
বাড়ায় মেঘের রাজ্যে গলা,
আরো ঊর্ধ্বে
সমানে গর্জায় কালো ইস্পাতের পাখি।

ভাইবন্ধু, সাথীবৃন্দ!
আমাকে বুঝো না যেন ভুল:
আমার বিচারে জেনো অপরাধী নয়
এ যন্ত্রসভ্যতা।
আমি জানি বিলক্ষণ
এ প্রগতি আমাদের টুঁটি টিপে নেই।
গায়ে তার দেব না আমরা হাত।
আমরা গড়ে তুলব বাড়ি।
প্রকাণ্ড বিশাল একটা বাড়ি।
বাড়ির দেওয়াল হবে কংক্রিটের,
ইস্পাতের কড়িকাঠে তৈরি হবে বাড়ির কাঠামো
আমরা যারা সাধারণ লোক,
মেয়ে ও পুরুষ হাত ধরাধরি ক'রে

গড়ে তুলব বাড়ি—
মহানন্দে বাসা বাঁধবে সেখানে জীবন॥

একটি চিঠি

মনে পড়ে তোমার
সেই সমুদ্র?
যন্ত্রের সেই ঘর্ঘর?
আর উপকূলবাহী সেই জাহাজের
সঁ্যাৎসেঁতে অন্ধকার খোল?
তখন আমরা পাগলের মতো খুঁজছি—
কই, কোথায় ফিলিপিনের তটরেখা?
ফামাগুস্তার মাথার ওপর
কই, কোথায় সেই তারার ঝাঁক?
এক জাহাজ লোক দূরদিগন্তের দিকে
ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে—
আস্তে আস্তে নিভে আসছে দিনের আলো—
গায়ে এসে লাগছে গ্রীষ্মমণ্ডলের মৃদুমন্দ হাওয়া।
তোমার মনে আছে?
তারপর একে একে সমস্ত আশা
শূন্যে মিলিয়ে গেল।
সদ্‌গুণে
আর মনুষ্যত্বে
দৈবে
আর দিবাস্বপ্নে
ভেতরকার বিশ্বাস বলতে কিছুই আর
আমাদের রইল না।
মনে আছে? কী রকম অতর্কিতভাবে
আমরা ধরা পড়েছিলাম জীবনের ফাঁদে?
আমাদের আক্কেল হল
ঢের পরে।
নিষ্ঠুরভাবে আমাদের হাত-পা তখন বাঁধা
খাঁচায় বন্দী জানোয়ারের মতো

আমাদের সতৃষ্ণ নয়নে
ঝিলিক দিচ্ছিল তখন কাতর প্রার্থনা
তখন আমরা কী ছেলেমানুষই না ছিলাম!
কী ছেলেমানুষ!...

কিন্তু.... তারপর এক সময়ে
দুষ্ট ক্ষতের মতো,
না, না, কুষ্ঠের মতো
সব কিছু পচিয়ে খসিয়ে দিয়ে
আমাদের মনের মধ্যে শিকড় চালিয়ে দিল ঘৃণা।
তারপর সেই ঘৃণা বুনে চলল
শূন্যগর্ভ হতাশার নিষ্ঠুর জাল।

আর রক্তের মধ্যে বুকে হেঁটে চলল
তার পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠা ভয়।
কবেকার, সেই কোন কবেকার কথা সে সব।.....
তখনও
মাথার ওপর চাঁদের হাট বসিয়ে
হেলেদুলে হাওয়ায় ভাসত সিন্ধুশকুনের দল।
তখনও স্ফটিকের মতো
ঝলমলে ছিল আকাশ
আর শূন্যতা ছিল সীমাহীন নীল।
সন্ধে নাগাদ
দিগন্তে বিলীন হত শুভ্র পাল
আর মাস্তুলগুলো মিলিয়ে যেত কোথায়
সেই কোন দূরে।
কিন্তু সে সব দেখব কী, আমাদের চোখ তখন অন্ধ।
আমার কাছে পুরনো হয়ে গেছে সেই অতীত,
আজ তার কোনো দাম নেই—
তুমি আর আমি
একদিন আমরা ছিলাম একই জীবনের শরিক।

তাই আমার বিশ্বাসের কথা
তোমাকে আমি না বলে পারছি না;

কেন আজ মনে আমার এত সুখ—
আমি না বলে পারছি না।
আমার কপাল আমি ঠুকে ঠুকে ভাঙি নি—
নতুন জীবনই আমাকে ঠকিয়েছে ;
আর আমার অন্তর্জ্বালাকে রূপান্তরিত করেছে
আজকের সংগ্রামে।
এই নতুন জীবনই ফিরিয়ে আনবে ফিলিপিনের তটরেখা,
ফামাগুস্তার মাথার ওপর ফুটিয়ে তুলবে নক্ষত্রের ঝাঁক,-
আবার আমরা ফিরে পাব সেই আনন্দ
আমাদের বুকের মধ্যে যা ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

কলকজ্ঞার প্রতি
সমুদ্রের অন্তহীন নীলিমার প্রতি
আর গ্রীষ্মমণ্ডলের মৃদুমন্দ হাওয়ার প্রতি
আমাদের যে ভালবাসা একদিন মরে গিয়েছিল
সে ভালবাসা আবার প্রাণ পাবে।

এখন অন্ধকার।
ইঞ্জিনের ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দে ঠেলছে
সমানে ঠেলছে
উষ্ণ নিশ্বাস।
আলেয়ার আলো আমার কী অসহ্য,
যদি জানতে—
যদি জানতে
কী গভীরভাবে আমি ভালবাসি জীবনকে!
আমাদের মাথার চাড়ে খান খান হবে বরফ
—রাত্রির পর প্রভাতের মতোই
আমি জানি, তা না হয়ে পারে না।
যেখানে হেঁট হয়ে আছে অন্ধকার দিগন্ত
সেখান থেকে সূর্য—

আমাদের, হ্যাঁ, আমাদেরই
রাঙা টুকটুকে
সূর্য

উঠে আসবে
ছোট্ট প্রজাপতির মতোই
তার ঝাঁঝালো আলোয়
পাখা আমার পুড়ে যায় যাক,
আমি মুখ বুঁজে থাকব,
কেননা আমি জানি,
শত অভিশাপ শত অভিযোগেও
আমার মৃত্যু রদ হবে না

পৃথিবী যখন তার গা থেকে
অন্যায়ের ধুলোকাদা
সব ঝেড়ে ফেলেছে
যখন নবজন্ম হচ্ছে কোটি কোটি মানুষের,
ঠিক তখনই মৃত্যুকে বরণ করব
গানের মতো—

হ্যাঁ, গানই তো॥

গ্রামবার্তা

রেডিওতে কে একজন
মেলাই তড়পাচ্ছে।
কাকে বোঝাচ্ছে, হে?

আমি জানি না।
তবে বোধহয়—দেশের পাঁচজনকে।

বকতে দাও,
ওকে তো বকবার জন্যেই
মাইনে দিয়ে রেখেছে।

'আপনাদের ভালোর জন্যেই
সরকার বাহাদুরের

ফৌজসিপাহী সব তৈরি—
এখন শুধু হুকুমের ওয়াস্তা।

‘নিপাত যাক শ্লোগান!
ফেলে দিন নিশান!

‘ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান
গোয়ালভরা গরু—
সুখের অন্ত নেই।’

কফিখানায় একজন লোক
আর থাকতে না পেরে থুথু ফেলল।
পা দিয়ে থুথুটাকে ধুলোর ওপর বেশ মাড়িয়ে দিল।

তারপর চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে
বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল :
‘ভেবেছে হারামজাদারা আমাদের ওপর
খুব চাল চালবে।
আমরা সেই বান্দা কিনা!
ভগবান তো নিজের মুখেই বলেছেন—
‘দশের কথাই ভগবানের কথা।’
ক্ষিধেয় ভোঁচকানি-লাগা এক ছোকরা
শীতে হি-হি ক’রে কাঁপতে কাঁপতে বলল :

‘ঠিক বলেছেন,
উনিশ শো পনেরো সালেও
ঐ একই মিথ্যে কথা আপনাদের বলেছিল না?

‘তবে আজ এসে ওরা যদি
আমাদের মরতে বলে,
যদি বাধ্য করে
গুলির সামনে বুক পেতে দিতে—
তাহলে, যার মাথায় গোবর পোরা
সেও স্বীকার করবে—
সময় এসেছে

এবার আমাদের যা বলবার আছে বলব।

'আমাদের রুটি
আমাদের পোড়া কপালের চেয়েও কালো,
আমাদের তেলের পাত্রে
একফোঁটাও তেল নেই।

'সুতরাং আমি মনে করি,
আমাদের একটাই শ্লোগান—
দমনরাজ নিপাত যাক!
সোভিয়েতের হাতে হাত মেলাও!'

মানব-বন্দনা

দুজনে তুমুল তর্ক,
এক ভদ্রমহিলা আর আমি।
কথাটা উঠেছিল
একালের মানুষ নিয়ে।

ভদ্রমহিলার
রগচটা তিরিক্ষি মেজাজ,
আমি শেষ না করতেই
মাটিতে দুম দুম ক'রে পা ঠুকে
তিনি জবাব দিচ্ছিলেন,
বোঝা মুস্কিল হচ্ছিল তাঁর নালিশটা ঠিক কী,
তাঁর মুখের সামনে দাঁড়ানো যাচ্ছিল না।

আমি বলে উঠলাম, 'দাঁড়ান! এই যে দেখছেন.
কিন্তু আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই
রেগেমেগে তিনি বললেন,
'দোহাই আপনার, চুপ করুন তো!
আমি বলছি—মানুষকে আমি ঘেন্না করি
আপনার যুক্তিগুলো আপনি অপাত্রে ঢালছেন।
কাগজে পড়েছিলাম

একজন লোক দা দিয়ে
তার নিজের ভাইকে
কুপিয়ে মেরেছিল।
তারপর ধোপদুরস্ত হয়ে গির্জায় গিয়েছিল
প্রার্থনা করতে
তাতে সে বেশ হালকা বোধ করেছিল,
একথা সে পরে বলেছে।'

শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল,
কেমন যেন দমে গেলাম।
সরল মনে আমি ভেবে দেখলাম,
বই-পড়া বিদ্যেয়
আমার তেমন দখল নেই,
তার চেয়ে একটা ঘটনার কথা
ধরা যাক।

মোগিলা বলে এক গ্রাম—
ঘটনাটা সেখানেই ঘটেছিল।
বাপের ছিল
কিছু লুকোনো টাকা।
ছেলে জানতে পেরে
জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছিল
তারপর গুমখুন করেছিল বাপকে।

কিন্তু মাসেক কাল কি
সপ্তাহখানেক পরে
ছেলেটা ধরা পড়ল।
আদালত জায়গাটা
কারো মামার বাড়ি নয়—
বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হল।
তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হল
কয়েদখানায়,
সেখানে তাকে দেওয়া হল
নম্বর-মারা চাকতি আর লোহার সান্‌কি।

কিন্তু সেই জেলখানাতেই
অকপট সাচ্চা মানুষের
সে দেখা পেল।

একদিন কোন জাদুস্পর্শে
সে বদলে গেল জানি না,
জানি না
কোথা দিয়ে কী হল।
ব'কে ব'কে মুখে ফেনা তুলেও যা হয় নি—
তা সম্ভব হল গানের ভেতর দিয়ে।
একটি গানই তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল
তার নিয়তির নির্বন্ধ।
পেটে যখন দানা নেই
অভাবে মাথা যখন ঝিমঝিম করছে
একটি ভুল পদক্ষেপ হলেই
তুমি ডুবেছ।

'বলীবর্দের মতো
এখন তুমি বলির অপেক্ষায়,
যেদিকেই তাকাও,
তোমার চোখের সামনে নাচছে কশাইয়ের ছুরি।
জগৎটার এমনই লক্ষ্মীছাড়ার দশা,
জীবনটা বদলে গেলে বেশ হত....'

ব'লে সে আস্তে আস্তে
চাপা গলায়
গান ধরল।
তার সামনে মিষ্টি স্বপ্নের মতো ভাসতে লাগল
জীবন।.....
গান গাইতে গাইতে
স্মিতমুখে
সে ঘুমিয়ে পড়ল।...

বাইরে গলিতে কারা যেন

ফিস ফিস ক'রে কী বলল।
এক মুহূর্ত সব চুপ।
তারপর খুব সন্তর্পণে কে যেন দরজা খুলল।
জনকয়েক লোক। পেছনে জেলের একজন সেপাই।

তাদের মধ্যে একজন
বাজখাঁই গলায়
চেঁচিয়ে বলল—
'ওহে চাঁদ, এবার উঠে পড়ো।'
অন্য যারা সঙ্গে এসেছিল
তারা ফ্যাকাসে দেয়ালটার দিকে মুখ ফিরিয়ে
ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

যে লোকটা এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল
সে বুঝতে পারল
তার আয়ু শেষ হয়ে গেছে।
অমনি সে তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল,
তারপর কপালের ঘাম মুছে,
বন্য বলদের মতো
ঘাড় ফিরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

আস্তে আস্তে
লোকটার হুঁশ হল—
ভয় ক'রে কোনো লাভ নেই
মরতে তাকে হবেই,
এক আশ্চর্য আলোয়
তার আত্মা উদ্ভাসিত হল।
'তাহলে রওনা হওয়া যাক, কী বলো?'
তার কথায় সকলে সায় দিল।

চলতে লাগল সে
বাকি সবাই তার পেছনে।
কী একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায়
তাদের গা

শিরশির করছে।
সেপাইটি তার মনকে এই ব'লে চোখ ঠারল,
'ব্যাপারটা এখন সুভালাভালি চুকে গেলেই হয়।'
বাছাধন, পালাবে কোথায়?

বাইরের গলিতে
ওরা চাপা গলায় কথা বলছে।
আনাচে কানাচে ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার।
হাঁটতে হাঁটতে তারা উঠোনে এসে পৌঁছুল।
তখন মাথার ওপর
আকাশ আলো ক'রে ফুটছে নতুন সকাল।

লোক-টা দেখল সকাল হচ্ছে,
দেখল আকাশে আলোর ঝর্ণাধারায়
স্নান করছে একটি নক্ষত্র
আর সেইসঙ্গে মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলল
মানুষ হিসেবে তার
মারাত্মক
হিংস্র
অন্ধ
নিয়তি।

'আমার দিন ফুরিয়েছে,
এবার ফাঁসির দড়িতে ঝুলব
তবু আমি বলব
এটাই শেষ নয়।
কেননা, এখানে জন্ম নেবে
গানের চেয়েও মধুর
ফাল্গুনের দিনের চেয়েও সুন্দর
একটি জীবন।....'

গানটার কথা মনে হতেই
কী একটা ভাবনার ঝিলিক খেলে গেল—
(তার চোখদুটো আগে থেকেই হাসছিল)

সারা মুখ এবার প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হল;
বুক টান ক'রে সে গাইতে শুরু ক'রে দিল।

এবার বলুন, আপনি এর কী ব্যাখ্যা দেবেন?
হয়ত বলবেন—
লোকটার হিস্টিরিয়ার ব্যামো,
মানসিক বিকারে ভুগছিল।
নিজের মর্জিমতো যাহোক একটা কিছু খাড়া করতে পারেন—
কিন্তু না ব'লে পারছি না,
আপনি ভুল করছেন।

লোকটা এমন শান্তভাবে
এমন জলদগম্ভীর স্বরে
একটি একটি ক'রে
গানের কলি গেয়ে যাচ্ছিল :
যে

ওরা সব হাঁ ক'রে তার দিক তাকিয়ে রইল
আর দুরু দুরু বুকে কড়া নজর রাখল
চোখে ধুলো দিয়ে যেন পালাতে না পারে।
গোটা কয়েদখানাটাই
থরহরি কম্পমান হচ্ছিল ভয়ে
অন্ধকার ত্রাহি ত্রাহি রবে
পালাচ্ছিল।
আকাশের তারাগুলো মুচকি মুচকি হেসে
তারস্বরে
লোকটার জয়ধ্বনি দিচ্ছিল :
'সাবাস ভাই, বীর বটে।'

শেষটা জলের মতো সহজ।
দড়িটা যেভাবে কাঁধের ওপর এসে পড়ল
তাতে পাকা হাতের ছাপ বোঝা যায়।
তারপরই মৃত্যু।
কিন্তু তখনও তার ব্যথায় বিকৃত

রক্তহীন নীল ঠোঁটে
গানের সেই কলিগুলো যেন লেগে রয়েছে।

এবার আমরা চলে এলাম শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে।
হে আমার পাঠকপাঠিকা,
আপনারাই বা কী মনে করেন?

এদিকে তো সে ভদ্রমহিলা
ফোঁপাতে শুরু ক'রে দিয়েছেন,
এক সময় হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি চেঁচাতে লাগলেন

'কী ভয়ের কথা! ইস্ কী সাংঘাতিক!
আপনি এমনভাবে সব বললেন
যেন নিজের চোখে দেখা!....'

এর মধ্যে ভয়ের কী আছে?
একটা লোক একটা গান গেয়েছিল—
সুন্দর একটা গান।
তাই না?

গোর্কি

আমি কাজ করতাম এক কারখানায়
মাথার ওপর নিচু হয়ে ঝুলে থাকত
ঝুলমাখা আকাশ।
লোহাবাঁধানো থাবা দিয়ে
সেখানে আমাদের মেরে মেরে পাট করত
জীবন,
আর হাড়-ভাঙা খাটুনি দিয়ে
আমাদের কপালে ফেলত
বলিরেখা।

মানুষগুলোর মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগাতে,
যে মিথ্যেগুলো
জমে জমে

জগদ্দল পাথর হয়ে
তাদের বুকের ওপর
চেপে বসেছিল,
সেই পাথর ভাঙতে—
আমাদের কী সংগ্রামই না করতে হয়েছিল।

আমি কাজ করতাম এক কারখানায়
মাথার ওপর নিচু হয়ে ঝুলে থাকত
ঝুলমাখা
আকাশ,
সেখানে জীবন আমাদের মেরে মেরে পাট করত
আর দিনগুলো
মরচে-ধরা পেরেকের মতো—
আমাদের মনগুলোকে এঁটে ধরতো।

কিন্তু আমার মনে পড়ে, যখনই আমরা পড়তাম
'নিচুতলা'
কিংবা
'মা'
অমনি কারখানার তেলচিটে ছাদ ফুঁড়ে
দেখা দিত সূর্য—
আর আমাদের চোখগুলো
চক্‌চক্ ক'রে উঠত।

এঁদো গলিতে থাকা বস্তির মানুষগুলো
ঘষে ঘষে তুলে ফেলত
চিন্তার মরচে,
খুশি হত,
তারা কী খুশিই যে হত।....
আজ সকালে
আগওয়ালা এসে বলল:
ভাপ্‌ৎসারভ,
স্টীম সব শেষ!'
আমি চম্‌কে উঠে
তার চোখের দিকে তাকালাম।

গজ্‌গজ্‌ করতে করতে সে
ওপরতলায় চলে গেল।

তারপরই ঝড়ের বেগে এসে ঢুকল
লোহাঘরের মিস্ত্রি,
উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল :
'তুমি কিছু জানো?' —তার গলা আরও চড়ল—
'বুড়োর মরবার খবরটা সত্যি?'
আমার হাতপা হিম হয়ে গেল,
হঠাৎ মুখ বিষ ক'রে বললাম:
থাক,
আর দাঁত বার করতে হবে না।
ঠিক ক'রে বলো
কে মারা গেছে?'
নামটা শোনামাত্র আমি বাইবে বেরিয়ে গেলাম
ইঞ্জিন-রুমের হাওয়ায়
        আমার দম আটকে আসছিল।
ঘরের মধ্যে জায়গা হচ্ছিল না
        আমার বেদনার।
তার সুরের সঙ্গে
        আমার সুর মিলছিল না।

আমার কানে এল
লোহাঘরের মিস্ত্রি কাকে যেন নিচু গলায় বলছে :
'ভায়া, কী নিখুঁতভাবে গোর্কি আমাদের জানতেন—
আমাকে, তোমাকে, আমাদের সবাইকে।
তিনি তোমাকে তাঁর কোনো বইতে তুলে ধ'রে
বলবেন: এখান থেকে নড়তে পারবে না।
তারপর তুমি পড়ে দেখ,
        অবাক হয়ে যাবে
বইতে রয়েছ অবিকল তুমি।

'কিংবা ধরো,
ঘরে তোমার কচি ছেলে।
সে পড়ছে,

পড়ছে না ব'লে বলা যায়—বই হাতড়াচ্ছে।
তোমার পয়সা নেই।
ধরো,
        তোমার হাত খালি।
উনি বলবেন : নিশ্চয়,
        শিশুরা যা মন চায়
            তাই পড়বে।

'মনে করো
বুকভরা জ্বালাযন্ত্রণা নিয়ে
তুমি বাড়ি ফিরলে,
আর সেই চাপা রাগ ফেটে পড়ল তোমার স্ত্রীর ওপর।
মুখ তুলে
ভুরুর নীচে দিয়ে
তোমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে
উনি জিজ্ঞেস করবেন:
'কী, নুন আনতে পান্তা ফুরোয় বুঝি?'

মিস্ত্রি যাকে বলছিল
সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে।
জীবনের বন্ধ দুয়ার
    যেন হঠাৎ তার সামনে
        হাট হয়ে খুলে গেল,
বরফের যে শক্ত ডেলাটা
        এতক্ষণ তার বুকে আটকে ছিল,
        যেন মন্ত্রবলে সেটা মিলিয়ে গেল—

এখন তার কাছে
    সমস্তই জলের মতো পরিষ্কার।
আস্তে, খুব আস্তে শোনা গেল
সে বলছে :
'হ্যাঁ, একেই বলব সত্যিকারের মানুষ।'

স্পেন

কী ছিলে তুমি আমার কাছে?

কিছুই নয়
দূরের এক ভুলে-যাওয়া ভূখণ্ড,
অশ্বারোহী মল্লের
আর অভ্রভেদী মালভূমির দেশ।

কী ছিলে আমার কাছে?

তুমি সেই দেশ, যার মাটিতে ছিল
ঘর-জ্বালানো পর-ভোলানো এক নিষ্ঠুর ভালবাসা,
উঠত রক্তে নেচে যেখানে নেশার মত্ততা,
অসিতে অসি লেগে ফুলকি।
যে দেশে ছিল
বাতায়নতলে প্রেমাকাঙ্ক্ষীর নৈশ গীতবাদ্য,
ছিল ক্রোধ, ভালবাসা,
ঈর্ষা—
ছিল উপাসনার স্তোত্র।

এখন তুমি নিয়তি আমার,
তোমার মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে জড়ানো
আমার জীবন, আমার ভূতভবিষ্যৎ।
আর কিছুতেই আলাদা হব না।

তোমার প্রত্যেকটি যুদ্ধজয়ে
আমি উদ্দীপ্ত হই, আনন্দে উৎসব করি।
আমার অটুট আস্থা তোমার যৌবনে, তোমার শক্তিমত্তায়
তোমার বাহুবলে মেলাই আমার বাহুবল।

তোলেদোর রাস্তায় রাস্তায়
মাদ্রিদের শহরতলিতে
মেশিনগানের ছাউনিতে ছাউনিতে
জয়ের লক্ষ্যে ঘাড় গুঁজে আমি লড়ছি।

গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে অদূরে পড়ে রয়েছে
সুতির শার্ট গায়ে-দেওয়া এক মজুর।
চোখের ওপর টেনে দেওয়া তার টুপিটা থেকে
অনর্গল গড়িয়ে পড়ছে উষ্ণ রক্ত।

তার মুখের দিকে চোখ পড়তেই
চমকে উঠলাম। লোকটা আমার বিশেষ চেনা—
একটা সময়ে একই কারখানায়
আমরা কাজ করেছি।

আমাদের কাজ ছিল চুল্লির আগুন
খুঁচিয়ে গনগনে ক'রে তোলা।
আমাদের কাঁচা বয়সের স্পর্ধিত বাসনার সামনে
বাধা বলতে কিছুই ছিল না।

লোকটাকে হঠাৎ চিনতে পেরে
ধমনিতে আমার
নিজেরই রক্ত গুঞ্জন ক'রে উঠল।

ঘুমাও, যুদ্ধের সাথী আমার! শান্তিতে ঘুমাও।
রক্তরাঙা নিশান আজ গোটানো থাক—
তবু আমার ধমনি বেয়ে তোমার রক্ত
একদিন সারা পৃথিবীর মানুষকে নাড়া দেবে।

গ্রামে কারখানায় শহরে রাজ্যময়
তোমার রক্তের ঢেউ গিয়ে লাগছে;
ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে কানে কানে মন্ত্র দিচ্ছে,
উৎসাহের বান ডাকিয়ে বলছে : দেখিয়ে দাও—

মজুরের জাত কখনও দমবার পাত্র নয়—
তারা এগিয়ে যাবে, কারো সাধ্য নেই ঠেকায়।
বুক বেঁধে তারা কাজ করবে, তারা লড়বে;
রক্ত ঢালবে মানুষ যাতে স্বাধীন হয়।

আজ তোমার রক্তে উঠছে প্রতিরোধের দেয়াল,
আমরা সাহসে বেঁধে নিচ্ছি আমাদের বুক
আর বেপরোয়া উল্লাসে ঘোষণা করছি—
'মাদ্রিদ্ আমাদের!
আমাদেরই মাদ্রিদ্!'

বন্ধু, তুমি ভাবনা ক'রো না—
দুনিয়া আমাদের।
এই বিস্ফারিত বিশ্বজগৎ
আমাদেরই!
বিশ্বাস রাখো, আমাদের ভরসা করো
দক্ষিণের এই আকাশের তলায়
তুমি শান্তিতে ঘুমাও॥

দ্বৈরথ

হাত আমাদের ধরা
শক্ত পাঞ্জায়।
আমার হৃদ্‌পিণ্ড থেকে
চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত,
আর ক্ষয় হচ্ছে তোমার শক্তি।
তারপর?
তারপর আর কী—
একজন হেরে ঢোল হবে, চিৎপটাং হয়ে পড়বে
মাটিতে।
সে একজন হলে
তুমি।

বিশ্বাস হয় না? ভয় নেই বুঝি?
জেনে রাখো,
পর পর প্রত্যেকটা চাল আমার ভাবা।
আমার বাহুতে বল দিচ্ছে
আমার হৃদয়।
ক্রূর নৃশংস, হে জীবন—
তুমি হারবে।

এই আমরা প্রথম লড়ছি না, তুমি জানো।
সেই কবে শুরু হয়েছে আমাদের দ্বৈরথ—
তারপর কত দিন,
কত দীর্ঘদিন ধ'রে মরিয়া হয়ে আমরা লড়েছি।
আমাদের হাত
ধরা থেকেছে পাঞ্জায়।
তোমার মুষ্টিবদ্ধ হাতের হিংস্র আঘাত
আমি কখনোই ভুলব না।
খনিতে প্রচণ্ড শব্দে গ্যাসের বিস্ফোরণ হল,
মাথার ওপরে
স্তবকে স্তবকে কয়লা ভেঙে
চাপা পড়ল পনেরোটা মানুষ।
পনেরো জন
    জীবন্ত
        কবর।
তার একজন
    আমি।

কুলিবস্তির একটা ঘরের সামনে
পড়ে রয়েছে বন্দুক।
তার নলের মুখে ধোঁয়া তখনও লেগে।
শবদেহটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হচ্ছে।

কোনো চেঁচামেচি নেই,
        কোনো শোরগোল নেই।
একটি বুলেট, ব্যস!
তারপর—আঁস্তাকুড়ের ময়লা।
মরে যাওয়াটা যেন কিছুই নয়।....

লড়াই নেই,
বাঁচার ব্যগ্রতা নেই,
নেই ছটফট করা।

জানো তুমি,
সে কে?

সে হল
        আমি।

বৃষ্টির জলে ধোয়া ফুটপাথে,
    একজন মুখ থুবড়ে প'ড়ে।
গুলি এসে লেগেছিল আড়াল থেকে।
বারুদ-ঠাসা আকাশটা যেন
    চৌচির হয়ে ভেঙে পড়ল চৌমাথার চকে।

সেখানে রক্তে ভাসছে
    ঐ যে লোকটা—
আমারই ভাই সে,
তার নিষ্পলক চকচকে চোখে
ভালবাসা আর ঘৃণার
    আগুন।

তার আততায়ী
    ঘৃণিত সেই দুর্বৃত্ত
দেখতে না দেখতে
    হাওয়া হয়ে গেল।
সেই খুনী বদমাশটাকে তোমার মনে আছে?
    সে
        আমি।

পারীর ব্যারিকেডে যে শিশুটি প্রাণ দিয়েছিল
    তাকে মনে পড়ে?
মৃত্যু বরণ করেছিল সে
        কালান্তক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে
তার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত
আস্তে আস্তে
ইস্পাতের মতো ঠাণ্ডা হল।
তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে
তখন তখন ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল
একটুখানি হাসি।

ঠোঁট নীল হলেও
তখনও তার চোখ
    উৎসাহে জ্বলজ্বল করছিল,
তার চোখ যেন গাইছিল,
    'লিবার্তে শেরি!'

গুলিবিদ্ধ শিশুটি
    যেমন তেমনিই
    পড়ে থাকল—
হিমার্ত মৃত্যুর দখলে।
জানো তুমি,
সে কে?
সে
    আমি।

কুয়াশার যে রাজ্যে যেতে
    পাখিদেরও সাহসে কুলোয় না
আকাশের মেঘ ফুঁড়ে সেখানে উড়ে গেল
    আনন্দে
        নেচে নেচে
        একটি ইঞ্জিন—
তোমার মনে পড়ে?

তার পাখায় চিরে চিরে গেল
    হিমশীতল যবনিকা,
আর বদল হল পৃথিবীর কক্ষপথ—

গ্যাসোলিনের বাষ্প-বিস্ফোরণে
        প্রগতির পথ প্রশস্ত হল।
যে ইঞ্জিন মহাশূন্যে গান গায়
তা আমারই হাতের তৈরি,
আমার প্রাণের তুল্য
ইঞ্জিনের গান।
কম্পাসের কম্পিত কাঁটায়
আঠার মতো লেগে ছিল

যার বিচক্ষণ দৃষ্টি,
যে লোকটা
সুমেরুবৃত্তের জমাট বরফ ভেদ ক'রে
কুয়াশা পায়ে ঠেলে
দুরন্ত সাহসে এগিয়ে এসেছিল
সে কে,
তুমি জানো?
সে
আমি।

আমি কাছে
আমি দূরে
আমি সব জায়গায় আছি।
আমি উদয়াস্ত খাটি টেক্সাসের কলে,
আমি মাল বই আলজেরিয়ার বন্দরে,
কিংবা গান বাঁধা কাজ আমার...
আমাকে সব জায়গাতেই পাবে।

ভ্রুকুটিভরে তাকানো
পাজির পা-ঝাড়া,
নীচাশয়,
হে জীবন।
তুমি কি মনে করো জিতবে?
জ্বলছি
আমি,
জ্বলছ তুমি,
আমরা দুপক্ষই
ঘেমে নেয়ে উঠেছি।

কিন্তু তুমি ফুরিয়ে ফেলছ তোমার শক্তি।
যতই দুর্বল হচ্ছ,
যতই তোমার শেষ ঘনিয়ে আসছে,
ততই তুমি হিংস্র আক্রোশে
আমাকে দিচ্ছ দংশনের জ্বালা,
হয়ত

আসন্ন মৃত্যুরই ভয়ে।....

তাহলে
তোমাকে সরিয়ে দিয়ে
সে জায়গায়
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
সকলে হাত ধরাধরি ক'রে
আমরা গড়ে তুলব
আমাদের মনের মতন
ঠিক যেমনটি দরকার
তেমনি
জীবন—

সে জীবন
কতই না সুন্দর হবে!

দিন আসবে

এই আমি—
এই নিই হাওয়ায় নিশ্বাস,
কাজ করি,
প্রাণের প্রাচুর্যে থাকি বেঁচে,
(নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে)
আমার কবিতা যাই লিখে।
জীবনের ভ্রুকুটির চোখে
চোখ রাখে কটাক্ষ আমার।
আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে
জীবনের সঙ্গে আমি যুঝি।
জীবনের সঙ্গে থাক যতই বিবাদ—
ভুলেও ভেবো না
আমি করি জীবনকে ঘৃণা।
বরং উল্টোটা সত্য—
মরে যাই সেও ভালো
তবু চাইব

জীবনের বাঘনখ
আমাকে জড়াক বাহুডোরে!
যদি কোনোদিন
        আমাকে ফাঁসির মঞ্চে তুলে
        গলায় দড়ির ফাঁস পরাতে পরাতে
        জল্লাদেরা বলে:

'প্রাণে যদি শখ থাকে আরও এক ঘণ্টা বাঁচতে পারো'—

তক্ষুনি চিৎকার ক'রে ব'লে উঠব:
        'খুলে দাও,
        খুলে দাও শয়তান কাঁহাকা!
        ছুটে এসো—
        খুলে দাও দড়ি।'

জীবনের জন্যে যদি হয়--
আমাকে যে কাজ দেবে
নেব মাথা পেতে
আকাশে পরীক্ষা নেব প্রাণ হাতে ক'রে
        বিমানযন্ত্রের।
খুঁজব নতুন গ্রহ যা অদৃষ্ট আজো—
মহাকাশে
ছুটে যাব
একা—
রকেটের প্রবল গর্জনে।

মুখ তুলে
চেয়ে থাকব
তখনও আকাশে—
বিস্মিত পুলকে।
জীবন তখনও দেবে
আনন্দের দোলা—
তখনও রোমাঞ্চকর হয়ে থাকবে
এ মাটিতে এই বেঁচে থাকা।

কিন্তু দেখ,
যদি তুমি হাত দাও
আমার বিশ্বাসে,
রাগে আমি অন্ধ হব
আহত বাঘের মতো
আক্রোশে লাফিয়ে পড়ব ঘাড়ে।

কেননা বিশ্বাস গেলে
কিছুই থাকে না।
যদি খোয়া যায় এককণাও বিশ্বাস
থাকি না আমাতে আর আমি।

সহজ কথায় বললে
কথাটা দাঁড়ায়—
আমার বিশ্বাস খোয়া গেলে
আমিই থাকি না।
এ রাত প্রভাত হবে;
দিন আসবে,
জীবন সুখের দেখবে মুখ,
পরিণামদর্শী হবে
অভিজ্ঞ জীবন।

মন থেকে আমার বিশ্বাস
চাও তুমি মুছে দিতে?
বুলেটে
ওড়াবে?

কী দরকার!
বৃথাই খরচ হবে গুলি।

আমার বুকের বর্মে ঢাকা
বিশ্বাস আমার।
আমার বিশ্বাস ভাঙবে
তেমন বুলেট
ত্রিভুবনে নেই॥

স্মৃতি

আমার কাজের সঙ্গীটিকে
মনে পড়ে
—কী ভালো যে ছিল সেই ছেলেটি।

দোষ তার একটাই ছিল শুধু কাশত।
কাশতে কাশতে হয়ে যেত নীল।

বয়লারে আগুন দেওয়া—
প্রত্যহ রাত্রের শিফ্‌টে
পুরোদমে বারো ঘণ্টা কাজ।
ঘাড়ে ক'রে বস্তা বস্তা কয়লা বইত,
পুড়ে গেলে ফেলে আসত ছাই।

ঝুলকালি ভেদ ক'রে
আমাদের নিরুদ্ধ পিঞ্জরে
কচিৎ কখনও যদি দেখা দিত
একফালি রোদ—

দৃষ্টি তার কী আগ্রহে মেটাত পিপাসা।
তার সে চাতক দৃষ্টি
চোখ বুঁজলে আজও দেখতে পাই।

যখন বসন্ত আসত
দূর থেকে
ভেসে আসত পাতার মর্মর।
ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়ে যেত
আকাশে বলাকা—

কী দুরন্ত পিপাসায়
সে হত কাতর!
চোখে তার আবেদন,
দুঃসহ বেদনা—
কী যে দুর্বিষহ সে বেদনা!

বসন্ত আবার যেন ফিরে আসে
আরেকটি বসন্ত যেন দেখে যেতে পারি—
এই তার করুণ মিনতি।

একদা বসন্ত এল
রূপ যেন ফেটে পড়ছে,
সঙ্গে সূর্য।
স্নিগ্ধ হাওয়া,
ফুটন্ত গোলাপ।

মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ
বয়ে আনল
চাঁপার সৌরভ।
আমরা রইলাম তবু
যে তিমির সেই তিমিরেই
বুকে নিয়ে জগদ্দল পাথরের ভার।
হঠাৎ একদিন
জীবনের তাল গেল কেটে।

বয়লারে গোলমাল দেখা দিল
কী কারণে কিছুই জানি না।
প্রথমে ঘড়ঘড় শব্দ,
তারপর একেবারে চুপ।
হয়তো বা সেই ছোকরা
মরেছিল ব'লে।

অথবা আমারই ভুল।
চেয়েছিল হয়তো সে
বয়লার
আগুনে ইন্ধন দিক
পরিচিত হাত।
হলেও তা হতে পারে
জানিনা সঠিক।
মনে হল, ফোঁপাতে ফোঁপাতে

অস্ফুট কাতরস্বরে বলছিল বয়লার :
'কোথায়, কোথায় গেছে বলো সে ছেলেটি!

সেই ছেলেটি?
মারা গেছে।
বাইরে বাড়াও মুখ, দেখ—
বসন্ত এসেছে।
দূরে বহুদূরে
পাখিরা আকাশে উড়ছে।
আর কোনোদিন
সেই ছেলেটি ও দৃশ্য দেখবে না।

আমার কাজের সঙ্গীটিকে
মনে পড়ে
—কী ভালো যে ছিল সে ছেলেটি।
দোষ তার একটাই ছিল—
শুধু কাশত।
কাশতে কাশতে হয়ে যেত নীল।

বয়লারে আগুন দেওয়া—
প্রত্যহ রাত্রের শিফ্‌টে
পুরোদমে বারো ঘণ্টা কাজ।
ঘাড়ে ক'রে বস্তা বস্তা কয়লা বইত
পুড়ে গেলে ফেলে আসত ছাই।।

রোমান্স

আজ
যে কবিতা
রচনা করার ইচ্ছা

তাতে
ছত্রে ছত্রে
থাকে যেন
একালের সুর-—

স্পর্ধায়
যেমন ক'রে
দৈত্যকায় ডানা
ঝাঁট দেয়
এ পৃথিবী
মেরু থেকে মেরু—

কেন লোকে খেদ করে?
অতীতের জরাজীর্ণ
স্বপ্নজাল নিয়ে
কেন ফেলে দীর্ঘশ্বাস এত?

নীল মহশূন্যে গতিমুখর ইঞ্জিনে
আজকের রোমান্স,
আগে সে-গানের বোঝো ধ্রুবপদ—
আশা ছেড়ো পরে।

সেই গান আনে
ইস্পাতের স্ববশ ডানার
দারুণ দৃঢ়তা
মানুষের প্রাণে।

অচিরকালের মধ্যে এই সব পাখি
ভূমিতে
ছড়াবে বীজ।

আকাশে বাতাসে তোলে প্রতিধ্বনি
পাখিদের গান
মানবমুক্তির নামে
জয়ধ্বনি দেয়।

পাখা মেলে হবে তারা পার
মহাসমুদ্রের নীল জল
গ্রীষ্মমণ্ডলের রাঙা মাটি

সবুজ জঙ্গম শস্য
চিরতুষারের শুভ্র দেশ।

ছোট ছোট গণ্ডি ভেঙে দিয়ে,
পৃথিবীকে
আলিঙ্গনে বেঁধে
বিমানে গতির পাল্লা
জন্ম দিচ্ছে,
সস্নেহে লালন করছে

দেখ—
নতুন রোমান্স।

শেষকথা

ভেঙেছে বাঁধ হৃদয়হীনতার ঢেউ—
লোকে বলছে,
রামরাবণের যুদ্ধ।
আমি যাচ্ছি।

জায়গা নেবে আর কেউ
কে গেল কে এল—-সে নাম তুচ্ছ।

এই তো সহজ নিয়ম, এই তো বাস্তব
এক বুলেটে—
কৃমিকীটের খাদ্য
ছুটে আসব আবার,
প্রিয় ভাই সব,
বজ্রে যখন বাজবে ঝড়ের বাদ্য॥

রচনাকাল : ১৯৫৭-১৯৬০

য ত দূ রে ই যা ই

বন্ধু অশোক ঘোষ-কে

যেতে যেতে

তারপর যে-তে যে-তে যে-তে
এক নদীর সঙ্গে দেখা।

পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা
পরনে
উড়ু-উড়ু ঢেউয়ের
নীল ঘাগরা।

সে-নদীর দুদিকে দুটো মুখ।

এক মুখে সে আমাকে আসছি ব'লে
দাঁড় করিয়ে রেখে
অন্য মুখে
ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

আর
যেতে যেতে বুঝিয়ে দিল
আমি অমনি ক'রে আসি
অমনি ক'রে যাই।

বুঝিয়ে দিল
আমি থেকেও নেই,
না থেকেও আছি।

আমার কাঁধের ওপর হাত রাখল
সময়।
তারপর কানের কাছে
ফিসফিস ক'রে বলল—

দেখলে!
কাণ্ডটা দেখলে!
আমি কিন্তু কক্ষনো
তোমাকে ছেড়ে থাকি না।

তার কথা শুনে
হাতের মুঠোটা খুললাম।
কাল রাত্রের বাসি ফুলগুলো
সত্যিই শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।...

২

গল্পটার কোনো মাথামুণ্ডু নেই ব'লে
বুড়োধাড়িদের একেবারেই
ভালো লাগল না।
আর তাছাড়া
গল্পটা বানানো।

পাছে তারা উঠে যায়
তাই তাড়াতাড়ি
ভয়ে ভয়ে আবার আরম্ভ করলাম:

'তারপর যে-তে যে-তে যে-তে....

দেখি বনের মধ্যে
আলো-জ্বালা প্রকাণ্ড এক শহর।
সেখানে খাঁ খাঁ করছে বাড়ি,
আর সিঁড়িগুলো সব
যেন স্বর্গে উঠে গেছে।

তারই একটাতে
দেখি চুল এলো ক'রে বসে আছে
এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা।'....

লোকগুলোর চোখ চকচক ক'রে উঠল।
তাদের চোখে চোখ রেখে
আমি বলতে লাগলাম—

'তারপর সেই রাজকন্যা
আমার আঙুলে আঙুল জড়ালো।
আমি তাকে আস্তে আস্তে বললাম :

তুমি আশা,
তুমি আমার জীবন।

শুনে সে বলল :
এতদিন তোমার জন্যেই
আমি হাঁ ক'রে বসে আছি।'

বুড়োধাড়িরা আগ্রহে উঠে ব'সে
জিজ্ঞেস করল: 'তারপর?'

ব্যাপারটা তাদের মাথায় যাতে ঢোকে
তার জন্যে
ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে
মিলিয়ে যেতে যেতে আমি বললাম—

'তারপর? কী বলব—
  সেই রাক্কুসিই আমাকে খেলো'॥

পায়ে পায়ে

সারাক্ষণ
সে আমার পায়ে পায়ে
          সারাক্ষণ
        পায়ে পায়ে
ঘুরঘুর করে।

তাকে বলি : তোমাকে নিয়ে থাকার
সময় নেই—
হে বিষাদ, তুমি যাও
এখন আমার সময় নেই
তুমি যাও।
গাছের গুঁড়িতে বুক-পিঠ এক ক'রে
যৌবনে পা দিয়ে রয়েছে
একটি উলঙ্গ মৃত্যু—
আমি এখুনি দেখে আসছি :

পৃথিবীতে গাঁক গাঁক ক'রে ফিরছে
যে দাঁত-খিঁচোনো ভয়,
আমি তার গায়ের চামড়াটা
খুলে নিতে চাই।
চেয়ে দেখো, হে বিষাদ—
একটু সুখের মুখ দেখবে ব'লে
আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে
চুল সাদা ক'রে আহম্মদের মা।

হে বিষাদ,
তুমি আমার হাতের কাছ থেকে সরে যাও
জল আর কাদায় ধান রুইতে হবে।
হে বিষাদ,
হাতের কাছ থেকে সরে যাও
আগাছাগুলো নিড়োতে হবে।

যায় না;
বিষাদ তবু যায় না।
সারাক্ষণ আমার পায়ে পায়ে
সারাক্ষণ
পায়ে পায়ে
ঘুরঘুর করে।

আমি রাগে অন্ধ হই
আমার বেদনাগুলো তার দিকে
ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারি।
বলি : শয়তান, তোকে যমে নিলে
আমি বাঁচি!

তারপর কখন
কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছি জানি না—
চেয়ে দেখি
দূরে ব'সে সেই আমার বিষাদ
আমাকে একেবারে ভুলে গিয়ে

আমার অপূর্ণ বাসনাগুলোকে নিয়ে খেলছে।

হাসতে হাসতে আমি তাকে
দুরন্ত শিশুর মতো
কোলে তুলে নিই।।

দিনান্তে

পশ্চিমের আকাশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে
যেন কোনো দুর্ধর্ষ ডাকাতের মতো
রাস্তার মানুষদের চোখ রাঙাতে রাঙাতে
নিজের ডেরায় ফিরে গেল

সূর্য।

তার অনেকক্ষণ পরে
সরজমিন তদন্তে
দিনকে রাত করতে
যেন পুলিশের
কালো গাড়িতে এল

সন্ধ্যা।

আলোটা জ্বালতেই
জানলা দিয়ে বাইরে
লাফিয়ে পড়ল

অন্ধকার।

পর্দাটা সরাতেই
ভয়চকিত হরিণীর মতো
আমাকে জড়িয়ে ধরল

হাওয়া॥

পোড়া শহরে

তেলচিটে সবুজ ঘাস একসঙ্গে লাইনবন্দী হয়ে
ঘাড় উঁচু ক'রে দেখছে—

কেমন ক'রে এ পোড়া শহরে
বুকের আঁচল খসিয়ে দিয়ে
কী আগ্রহে শুয়ে আছে
আশ্বিনের আশ্চর্য সকাল
রং যার
ঠিক চাঁপাফুলের মতো।

দাঁড়ানো মানুষগুলোকে বগলদাবা ক'রে
তুলে নিয়ে
বেলা দশটার ট্রাম
ঝুলতে ঝুলতে চলে গেল।

কালো কালো মাথাগুলো অদৃশ্য পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে
যেন আত্মসমর্পণের এক ভঙ্গিতে
হাত উঁচু ক'রে আছে।
কালো কালো মাথাগুলো
চোখে ফুটছে।

বাইরে শাড়িতে ঢাকা
দুটো শুভ্র পা
আমাদের দূরবর্তী ভবিষ্যতের মতো—
তার মুখচ্ছবি কেমন
কোনোদিনই জানব না।

হঠাৎ
আমার ইচ্ছে হল ছুটে পালিয়ে যেতে।
আমার ইচ্ছে হল যেতে—
যেখানে তার চোখের
উজ্জ্বল নীল মণির মতো আকাশ।
যেখানে ঢেউ তুলে আমাকে ডেকে নেবে নদী

যেখানে যাব
আর আসব না।

তারপর ট্রাম থেকে নেমে
ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাতে লাগলাম।
পালাতে পালাতে
পালাতে পালাতে
ইঁটকাঠের প্রকাণ্ড একটা রাক্ষুসে হাঁ-মুখ
আমাকে ঢেকে নিল।।

পাথরের ফুল

১

ফুলগুলো সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল জমতে জমতে পাথর।

পাথরটা সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।

এখন আর
আমি সেই দশাসই জোয়ান নই।
রোদ না, জল না, হাওয়া না—
এ শরীরে আর
কিছুই সয় না।

মনে রেখো
এখন আমি মা-র আদুরে ছেলে—
একটুতেই গলে যাবো।

যাবো বলে
সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছি—
উঠতে উঠতে সন্ধে হল।
রাস্তায়
আর কেন আমায় দাঁড় করাও?

অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর
গাড়ি এখন টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে।
মোড়ে
ফুলের দোকানে ভিড়।
লোকটা আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল?

২

ঠিক যা ভেবেছিলাম
হুবহু মিলে গেল।
সেই ধূপ, সেই ধুনো, সেই মালা, সেই মিছিল—
রাত পোহালে
            সভা-টভাও হবে!
(একমাত্র ফুলের গলা-জড়ানো-কাগজে লেখা
নামগুলো বাদে)
সমস্তই হুবহু মিলে গেল।

মনগুলো এখন নরম—
এবং এই হচ্ছে সময়।
হাত একটু বাড়াতে পারলেই
ঘাট-খরচাটা উঠে আসবে।

এক কোণে ছেঁড়া জামা পরে
শুকনো চোখে
দাঁতে দাঁত দিয়ে

ছেলেটা আমার
পুঁটুলি পাকিয়ে ব'সে।

বোকা ছেলে আমার,
ছি ছি, এই তুই বীরপুরুষ?
শীতের তো সবে শুরু—
এখনই কি কাঁপলে আমাদের চলে?

ফুলগুলো সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল
জমতে জমতে পাথর।

পাথরটা সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।

৩

ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই
ফুলের ওপর কোনোদিনই আমার টান নেই।
তার চেয়ে আমার পছন্দ
আগুনের ফুল্‌কি—
যা দিয়ে কোনোদিন কারো মুখোশ হয় না।

ঠিক এমনটাই যে হবে,
আমি জানতাম।
ভালোবাসার ফেনাগুলো একদিন উথলে উঠবে
এ আমি জানতাম।
যে-বুকের
যে-আধারেই ভ'রে রাখি না কেন
ভালোবাসাগুলো আমার—
আমারই থাকবে।

রাতের পর রাত আমি জেগে থেকে দেখেছি
কতক্ষণে কিভাবে সকাল হয়;

আমার দিনমান গেছে
অন্ধকারের রহস্য ভেদ করতে।
আমি এক দিন, এক মুহূর্তের জন্যেও
থামি নি।
জীবন থেকে রস নিংড়ে নিয়ে
বুকের ঘটে ঘটে আমি ঢেলে রেখেছিলাম
আজ তা উথলে উঠল।

না।
আমি আর শুধু কথায় তুষ্ট নই;
যেখান থেকে সমস্ত কথা উঠে আসে
যেখানে যায়—
কথার সেই উৎসে
নামের সেই পরিণামে,
জল-মাটি-হাওয়ায়
আমি নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাই।

কাঁধ বদল করো
এবার
স্তূপাকার কাঠ আমাকে নিক।
আগুনের একটি রমণীয় ফুল্‌কি
আমাকে ফুলের সমস্ত ব্যথা
ভুলিয়ে দিক॥

যেন না দেখি

যেখানে আকাশের ছানিপড়া চোখের নীচে
তিন মাথা এক ক'রে আছে
লাঠি হাতে
খুনখুনে অন্ধকার

যেখানে সারাটা রাত
সারাটা দিন

শুধু টুপ টাপ
টুপ টাপ
মাটিতে পাতা পড়ার শব্দ

যেখানে স্টিমারের খালাসির মতো
স্মৃতি
শুধু রশি ফেলে ফেলে
জীবনের জল মাপে—

আমি জানি
শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া
একদিন আমাকেও সেইদিকে
ঠেলবে।
হে পৃথিবী, আমি যেন সেই
দিনের মুখ
না দেখি।

তার আগে
তুমি আমার দুটো চোখ
দুটো পায়ে
ঘুঙুরের মত বেঁধে দিও॥

লোকটা জানলই না

বাঁদিকের বুক-পকেটটা সামলাতে সামলাতে
হায়-হায়
লোকটার ইহকাল পরকাল গেল।

অথচ
আর একটু নীচে
হাত দিলেই সে পেত
আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ
তার হৃদয়

লোকটা জানলই না।

তার কড়িগাছে কড়ি হল
লক্ষ্মী এলেন
রণ-পায়ে।
দেয়াল দিল পাহারা
ছোটলোক হাওয়া
যেন ঢুকতে না পারে।

তারপর
একদিন গোগ্রাসে গিলতে গিলতে
দু-আঙুলের ফাঁক দিয়ে
কখন
খসে পড়ল তার জীবন

লোকটা জানলই না॥

যত দূরেই যাই

আমি যত দূরেই যাই
আমার সঙ্গে যায়
ঢেউয়ের মালা-গাঁথা
এক নদীর নাম--

আমি যত দূরেই যাই।

আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা

আমি যত দূরেই যাই॥

ফিরে ফিরে

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি।

বলেছিল : আসবেন
দেখব, আসবেন।
আচ্ছা, আসবেন দেখব।

বলেছিল।

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি।

বলেছিলাম : মা আমার,
খেলনা আনব—
মা আমার,
আজ ঠিক আনব।

বলেছিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি॥

কে জাগে

সেই কোন্ সকালে
এই শহর
তার প্রকাণ্ড মুঠোটা খুলে
দূরে দূরে
দূরে দূরে
আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছিল

তারপর সন্ধ্যা এসে
খুঁটে খুঁটে তুলে

এক জায়গায় আবার আমাদের
মিলিয়ে দিয়ে গেল।

বাইরে
আলোগুলোকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে
দরজা দেবার শব্দে
এখুনি ঘর অন্ধকার করবে
এই শহর।

এখুনি
রক্তে রক্তে শোনা যাবে
জলদগম্ভীর মহাকালের হাঁক
'কে জাগে?'

ভালোবাসার গা থেকে
ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে
তারস্বরে সগর্বে বলে উঠব :
'আমরা'॥

আরও গভীরে

মাথার ওপর গোল কালো পাথরটায়
শান দিচ্ছে নখ
বিদ্যুৎ
অন্ধ রাগে।

পিঁপড়েগুলো ক্ষুদে ক্ষুদে পায়ে
ছুটে পালাচ্ছে গর্তে।

ঝড় এখুনি উঠবে।

মাঠ জুড়ে থমথম করছে ভয়
ঘাসের ডগাগুলো কাঁপছে
আর কোথায় যেন ঝটপট
ঝটপট করছে।
দিগ্‌ভ্রান্ত পাখিদের ডানা।

ঝড় যদি আসে আসুক
চলে যেতে কতক্ষণ?

আমরা যেখানে আছি
আকাশে মাথা তুলে
সেখানেই থাকব

মাটির
আরও গভীরে
শিকড়গুলো চালিয়ে দিয়ে॥

ঘোড়ার চাল

১

মারা অত সহজ নয়
একটি আছে
আরেকটির জোড়ে

ঘোড়াগুলো বাঘের মতো খেলছে।

তোমাদের রাজাগুলোকে সামলাও হে,
নইলে
এই কিস্তিতেই মাত যে!

ঘোড়াগুলো বাঘের মতো খেলছে।

২

মরুভূমির কড়াইতে টগবগ
টগবগ করছে
ফুটন্ত তেল—

ভাগো!

রবারের বনে বনে ঝুলছে

দড়ির ফাঁস।

পালাও!

লোভের কাঁটা-মারা জুতোগুলো
পায়ে পায়ে বেধে
ছিঁড়ছে।

৩

চাল ফেরত নেই,
সারা পৃথিবীটাকে বাজি রেখে
আমাদের খেলা।
ওদের বল ওরা যেভাবেই সাজাক
আমরা আড়াই-ঘরের পাল্লায়
ওদের পাব।

ঘোড়াগুলো বাঘের মতো খেলছে।।

গণনা

আমাকে একটা ফুলের নাম বলো—

আমি বলে দেব
ওদের কপালে কী লেখা আছে।

রক্তের মতো লাল
আগুনের মতো উদ্‌গ্রীব
নিশানের মতো অশান্ত

মুষ্টিবদ্ধ
যার পাঁপড়িতে ঢাকা
এক ভয়ঙ্কর সুন্দর ক্ষুধিত শপথ।

আমি দেখতে পাচ্ছি—

রাস্তায় সারিবদ্ধ লাঠির শরশয্যা,
দু-নলের অনলে দুমদাম
মুখাগ্নি;
তারপর কাঁদুনে গ্যাসের মতো
ধোঁয়ার কালো গাড়ি
আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমি দেখতে পাচ্ছি—

হাতে হাতে ফিরছে একটা ফর্দ—
নিহতের
আহতের
নিখোঁজের।

দিনের আলোয়
মাটিতে থেবড়ে বসে
কারা যেন হেঁকে হেঁকে
সংখ্যাগুলো অবিকল মিলিয়ে মিলিয়ে
নিচ্ছে॥

রাস্তার লোক

চোখ পড়তেই
হঠাৎ আঁতকে উঠেছিল লোকটা।

তারপর ভালো ক'রে তাকিয়ে বুঝল,
না,
সে যা ভয় করেছিল তা নয়—

রাস্তার খোঁদলটার মধ্যে জমে রয়েছে
ট্রামলাইনের
মরচে-ধোয়া জল।

লোকটা আঁতকে উঠেছিল
কেননা সে জানত:
এখানে,
হ্যাঁ, এখানেই—

প্রাণপণে চাইল সে ভুলতে।

তারপর মনে হল
মাথায় লাঠির বাড়ি খেয়ে পড়ে-যাওয়া
গাঁয়ের হাড়-জিরজিরে বুড়োর মতো
রাস্তাটা
একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে—
এখন বলুক সে কী করবে!

লোকটা চমকে উঠে
চোখ
সরিয়ে নিল।

এবার সে মুখ উঁচু ক'রে হাঁটবে
যেন কিছুতেই
তার পায়ের নীচে
রাস্তাটা না দেখা যায়।

দূরে
পুরনো গির্জার কাঁধের ওপর দেখো
কী সুন্দর টলটলে নীল
পুজোর আকাশ

দিনের নিবন্ত আলোয়
ঝুঁকে পড়ে
চোখ কুঁচকে দেখছে

এখন
ঘড়িতে ক'টা বাজল।

অমনি লোকটার বুকের মধ্যে
ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল।
এখন,
হ্যাঁ, এখনই তো—

প্রাণপণে চাইল সে ভুলতে।

সামনে পা ফেলতে গিয়ে
লোকটা হঠাৎ
শিউরে পিছিয়ে এল।
ইস্, আরেকটু হলেই সে মাড়িয়ে দিয়েছিল
মায়ের কোল-ছেঁড়া
একটা দুধের বাচ্চাকে।

তারপর ভালো ক'রে তাকিয়ে বুঝল
আসলে তার মনেরই ভুল;
আজ অন্তত—
এ রাস্তার কোথাও
কোনো লাশ
পড়ে নেই।

কিন্তু
ঠিক সেই সময়
লোকটা শুনতে পেল—

পেছন থেকে
একটা নিষ্ঠুর দজ্জাল স্মৃতি
তার নাম ধ'রে
চিৎকার ক'রে ডাকছে।

হাত দিয়ে কান দুটো বন্ধ ক'রে
লোকটা তাড়াতাড়ি
পাশের একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল।

তারপর যেতে যেতে
বন্ধ দু-কানে সে শুনতে পেল
রাবণের চিতা
দাউদাউ ক'রে জ্বলছে॥

কেন এল না

সারাটা দিন ছেলেটা নেচে নেচে বেড়িয়েছে।

রাস্তায় আলো জ্বলেছে অনেকক্ষণ
এখনও
বাবা কেন এল না, মা?

ব'লে গেল
মাইনে নিয়ে সকাল-সকাল ফিরবে।
পুজোর যা কেনাকাটা
এইবেলা সেরে ফেলতে হবে।

ব'লে গেল।
সেই মানুষ এখনও এল না।

কড়ার গায়ে খুন্তিটা
আজ একটু বেশি রকম নড়ছে।
ফ্যান গালতে গিয়ে
পা-টা পুড়ে গেল।

জানলার দিকে মুখ ক'রে
ছেলেটা বই নিয়ে বসল মাদুরে
সামনে ইতিহাসের পাতা খোলা—

ঘড়িতে টিকটিক শব্দ।
কলে জল পড়ছে।
ও-বাড়ির পাঁচিলটা থেকে লাফিয়ে নামল

একটা গোঁফঅলা বেড়াল।

বাপের-আদরে-মাথা-খাওয়া ছেলের মতো
হিজিবিজি অক্ষরগুলো একগুঁয়ে
অবাধ্য—
যতক্ষণ পুজোর জামা কেনা না হচ্ছে
নড়বে না।

এখনও
বাবা কেন এল না মা?

রান্না কোন্‌কালে শেষ
গা-ধোয়াও সারা
মা এখন বুনতে ব'সে
কেবলি ঘর ভুল করছে।

খুট ক'রে একটা শব্দ—
ছিটকিনি খোলার।
কে?
মা, আমি খোকা।

গলির দরজায় ছেলেটা দাঁড়িয়ে।
এখন রেডিওয় খবর বলছে।
মানুষটা এখনও কেন এল না?

একটু এগিয়ে দেখবে ব'লে
ছেলেটা রাস্তায় পা দিল।
মোড়ে ভিড়;
একটা কালো গাড়ি;
আর খুব বাজি ফুটছে।

কিসের পুজো আজ?
ছেলেটা দেখে আসতে গেল।

তারপর অনেক রাত্তিরে
বারুদের গন্ধে-ভরা রাস্তা দিয়ে
অনেক অলিগলি ঘুরে
মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে
বাবা এল।

ছেলে এল না॥

বারুদের মতো

আকাশ রক্তচক্ষু,
পশ্চিমের সব জানলাই
হাট ক'রে খোলা।

গরাদের এপারে দেখো—
কয়েদির ডোরাকাটা পোশাকে
এক টুকরো রোদ
মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে
হাঁটু মুড়ে
যেন মগরেবের নমাজ পড়ছে।

ঘরের বাইরে
ঢেউতোলা টিনের নীচে
দায়মল-কাটা ছায়া
এখন মুরগিগুলোকে কুঁড়ো খাওয়াচ্ছে;
একটু পরেই উঠে গিয়ে
ঘাট থেকে
অন্ধকার কাঁধে ক'রে আনবে।

তারপর বেড়ার গায়ে
জোনাকিরা দল পাকিয়ে
উড়োজাহাজের আলোর সংকেতের মতো
সারা রাত
জ্বলবে আর নিববে।

তারপর শেষ রাত্রে
রাস্তায় ভারী বুটের শব্দে
গায়েবি টুপি প'রে
উঠোনে পা নামাবে ষড়যন্ত্র—
কানের কাছে মুখ এনে
ফিসফিস ক'রে বলবে:

'অন্ধকার
কালো বারুদের মতো,
দেশলাইটা দাও তো॥'

বোকা

ওহে খোকা! ব'সে পড়ো, ব'সে—
এদিকে তো পেকে গেল দাড়ি
কেন আর করো এ বয়সে
এর-ওর তার সঙ্গে আড়ি?

তার চেয়ে দেখে ডাইনে বাঁয়ে
পথে এসো। বদ্‌লিয়ে স্বভাব
চোখ বুঁজে হাত রেখে পায়ে
জোরসে বলো : ভাব ভাব ভাব!

এখনও নামের ঠিক আগে
চন্দ্রবিন্দু নেই, আজও আছো—
এই ঢের। বুকের চেরাগে
বাতি নিববে, বেশি যদি হাঁচো।

জলে আছে সুবিধের সাঁকো।
ঘাড়টা নুইয়ে হও কুঁজো—
কথাই রয়েছে : যাকে রাখো
সেই রাখে। ভালো ক'রে বুঝো।

অতএব বেছে ফেলো পোকা।
হাত তোলো। উঠে যাক তাঁবু।
মালা নাও, নাম করো, বোকা—
কুশাসনে ব'সে, হয়ে বাবু॥

রংরুট

হেরেছি? তাতে কী?
কখনও যায় না শীত
এক মাঘে।
আছে
লড়াইতে হারজিত।

পা তুলে টেবিলে
স্পর্ধা নাচায় ছড়ি
হাতের চেটোয়।

এসো নিচু হয়ে ভরি
শুকনো বারুদ
আশার নতুন খোলে।
বীরের হৃদয়
যেন লক্ষ্য না ভোলে।

অন্ধকারের পর্দা থাকুক
টানা।
সবুজ পাতায় ঢেকে দাও
আস্তানা।
মুখে এঁটে নাও মুখোশ;
আস্তে কথা।
চুপ।
যেন টের পায় না অবাধ্যতা।

পা তুলে টেবিলে
স্পর্ধা নাচায় ছড়ি
হাতের চেটোয়।

ক'টা বাজে?
        দেখো ঘড়ি।
বাইরে
কিসের আওয়াজ?
        মিছিলে কারা?
বাজাতে বাজাতে চলেছে
        কাড়া-নাকাড়া।

চোখে চোখে চায়
যারা ছিল দলছুট।
নাম লেখো। ময়দানে যাবে রংরুট।

হেরেছি? তাতে কী?
কখনও যায় না শীত
এক মাঘে।
        আছে
লড়াইতে হারজিত॥

এখন যাব না

বাতাসের কান আছে দেখছি—
হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন,
না, আমি গেলাম না নয়
আমাকে নিল না।

আপনাকে বলেই বলছি—
দেখুন, ও যে-গাছের আঙুর
তাতে টক না হয়ে যায় না।
আর তা ছাড়া এও তো ঠিক
সব বেড়ালের ভাগ্যেই
শিকে ছেঁড়ে না।

আপনাকে এই বলে দিচ্ছি, দেখে নেবেন—
কারো বাপের সাধ্যি নেই

লাথি মেরে
আমাকে এই পৃথিবী থেকে হটায়
আমি এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকলাম।
যতক্ষণ বরাবরের মতো
মানুষের কাজ স্বাস্থ্য খাদ্য শিক্ষা নিরাপত্তার
একটা ভালো ব্যবস্থা না হচ্ছে
ততক্ষণ
মৃত্যুর গলায় পা দিয়ে হলেও আমি বাঁচব।

তারপর জীবন যখন খুব ক'রে সাধবে
তখন ভেবে দেখব
যাব কি যাব না।।

ছাপ

কেউ দেয় নি কো উলু
কেউ বাজায় নি শাঁখ,
কিছু মুখ কিছু ফুল
দিয়েছিল পিছুডাক।

পরনে ছিল না চেলি
গলায় দোলে নি হার;
মাটিতে রঙিন আশা
পেতেছিল সংসার।

আকাশের নীল গায়ে
শপথের ইস্পাত;
দরজায় পিঠ দিয়ে
বাইরে গভীর রাত।

সারা বাড়ি থমথমে
সিঁড়ি একদম চুপ;
দেয়ালে নাচায় ধোঁয়া
জানলায় রাখা ধূপ।

মুঠো মুঠো তারা নিয়ে
কড়ি খেলছিল মেঘ:
ভুলে গেছে বুঝি হাওয়া
ঝড়ঝঞ্ঝার বেগ!

হঠাৎ যে কোথা থেকে
ছুটে এসেছিল ঝড়;
ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে
দুলে উঠেছিল ঘর।

দু জোড়া বন্ধ ঠোঁটে
থেমে গিয়েছিল গান;
চোখে রেখেছিল হাত
টেবিলের বাতিদান।

জীবনের হ্রদে স্মৃতি
চোখ বুঁজে দিল ঝাঁপ;
ভিজিয়ে সে-জলছবি
তুলে নিল এই ছাপ।।

আলো থেকে অন্ধকারে

এ শহরে

যেখানে গাছের নীচে
ঘাড় হেঁট ক'রে
চোখ রেখে একদৃষ্টে
কালো কালো খোয়া-ওঠা পিচে,
সংসারের ভাব দ্বন্দ্ব ভালো মন্দ ইত্যাকার
নানান বিষয়ে
ভাবনায় নিগূঢ় হয়ে
নখ খুঁটছে
মাথায় ঘোমটা দেওয়া আলো

সেখানে দাঁড়ালো
সারা অঙ্গে পাউডারের খড়ি মেখে
ভয় ভালোবাসা লজ্জা
সমস্ত ঘুচিয়ে
দুই বুকে তীক্ষ্ণ দুটি বল্লম উঁচিয়ে
ক্ষণকাল

তারপর
রাস্তার অপেক্ষমাণ ভিড় থেকে
গেঁথে নিয়ে রাত্রের শিকার
ময়দানের দিকে গেল হেঁটে

যেখানে সভ্যতা ভুলে
খালি পেটে
নখে দাঁতে জিভে দিয়ে ধার
দু পাশে দাঁড়িয়ে উঠে
হিংস্র অন্ধকার
টান মেরে খুলে দেবে নরকের দ্বার॥

পা রাখার জায়গা

পৃথিবীটা যেন রাস্তার খেঁকি-কুকুরের মতো
পোকার জ্বালায়
নিজের ল্যাজ কামড়ে ধ'রে
কেবলি পাক খাচ্ছে;
আর একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা প'ড়ো বাড়িতে
তার বিকট আর্তনাদই হল
জীবন

এই রকমের একটা শক্ত খোলসে ঢাকা
তরল বিষয়ের ওপর
মনকে তা দিতে বসিয়ে
একজন
একটা চাবির গোছা
দু-হাতে ঢালা-উপুড় করতে করতে

হেঁটে
রাস্তা পার হচ্ছিল

হঠাৎ ঘ্যাঁচ ক'রে শব্দ।
আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ফুটপাথে ওঠা।

কী কারণে বুক ধড়াস ধড়াস করছে,
কেনই বা গলা শুকিয়ে কাঠ,
এসব তলিয়ে ভালো ক'রে বুঝে নেবার জন্যে
রেলিঙে ঠেস দিয়ে একটু দাঁড়াতে হল।
এক কথায়,
মাতালের মতো ভুরু উঁচিয়ে
চোখ গুগলি ক'রে তাকানো চারটে চাকা
আর একটু হলেই
তাকে একটা বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে
ফেলছিল।

ছোকরার আক্কেল দেখে এক বুড়ো
ছানি-কাটা চোখের চশমাটা তার মুখের গোড়ায়
দূরবীনের মতো করে ধরে,
ডান হাতের লাঠিটা মাটি ছেড়ে ঈষৎ তুলে,
মুখ বুঁজে নাকের দুটো বড় ফুটো দিয়ে
আর হাতের লাঠিটা দিয়ে খুব জোরে
'হুঁঃ' আর 'ঠকাস'
এই দুটো শব্দ বার ক'রে
যেদিক দিয়ে উজিয়ে এসেছিল সেই দিকেই ফের
চলে গেল।

বিরক্ত হয়ে চাবির গোছাটা পকেটে রাখতে গিয়ে
নজরে প'ড়ল
গোটা রাস্তা তার দিকে ফিরে
তাকে আঙুল দিয়ে শনাক্ত করছে।
নিজেকে একটু একা পাবার জন্যে
তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে সে গা ঢাকা দিল।

একটু হেঁটে যাবার পর একটা চায়ের দোকান।
গরম কাপের ছ্যাঁকায়
মনটা ঠাণ্ডা হল।
সামনের ফুটপাথে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে
উবু হয়ে বসে লোহার কড়াইয়ের একটা উনুন
হাওয়ার মুখে খই ফুটিয়ে
কাঠকয়লার আগুনে ভুট্টাগুলোকে পোড়াচ্ছে।
মাটিতে চাপ-চাপ রক্তের মতো ফুল;
ভুট্টার রং মানুষের গায়ের মতো।

খালি কাপটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে
লোকটা হঠাৎ উঠে পড়ল।
তিন নয়া পয়সার মিঠে পানে
মুখটা মিষ্টি ক'রে
মোড়ের ওপর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে
হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিল।

তারপর লক্ষহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে
পা ধরে যাওয়ায়
যেখানে এসে সে দাঁড়াল, সেখানে সামনেই একটা
শো-কেস।
ভেতরে খুব বাহারে সব জিনিস
আহ্ হা! রেফ্রিজারেটার! বেশ রেডিওটা! ওহো,
তাহলে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস
এখন বেশ শস্তায় বাজারে পাওয়া যাচ্ছে!
একটা ভালো শাড়ি আর মেয়ের একটা লাল ফ্রক
কেনা দরকার অনেক দিন থেকে বলেছিল বটে।
ঘড়ি কিনব
সবুর করো, আরেকটু শস্তা হোক।
আচ্ছা, একটা ইলেকট্রিক ক্ষুরের দাম কত?
এহে, দাম-লেখা কাগজটা পেছন ফিরে রয়েছে।

তারপর সে গালে হাত দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল
এখুনি কামাবার দরকার আছে কিনা।
কাঁচের গায়ে ছায়া পড়েছে,

আরও একটু কাছে সরে গেল।
জামা নয়, শাড়ি নয়, রেডিও নয়, ঘড়ি নয়,—
কী আশ্চর্য—
কাঁচের গায়ে অবিকল সে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে;
তার সামনে আস্ত একটা মানুষ
বুক টান ক'রে দাঁড়িয়ে।
দেখে সে যেন এই প্রথম আবিষ্কার করল
পৃথিবীর
জীবনের
সমস্ত শূন্যতা ভরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে
যে দুটো হাত—
কী আশ্চর্য, সে হাত দুটো
সমস্তক্ষণ তো তার পাশাপাশিই ছিল॥

তারপরই একটা ভর্তি বাসের হাতল ধরে
ছুটতে ছুটতে—
সেই লোকটির মালকোঁচা-মারা আস্তিন-গোটানো
বাজখাঁই গলা শোনা গেল :

'হাতটা সরিয়ে নিন না, মশাই!
ও দাদা, একটু এগিয়ে যান—
দয়া ক'রে,
স্যার, একটু পা রাখার জায়গা'॥

মেজাজ

থলির ভেতর হাত ঢেকে
শাশুড়ি বিড়বিড় বিড়বিড় ক'রে মালা জপছেন;
বউ
গটগট গটগট ক'রে হেঁটে গেল।

আওয়াজটা বেয়াড়া; রোজকার আটপৌরে নয়।
যেন বাড়িতে ফেরিঅলা ডেকে
শখ ক'রে নতুন কেনা হয়েছে।

সুতরাং
মালাটা থেমে গেল; এবং
চোখ দুটো বিষ হয়ে
ঘাড়টাকে হেলিয়ে দিয়ে যেদিকে বউ যাচ্ছিল
সেইদিকে ঢলে পড়ল।
নীচের চোয়ালটা সামনে ঠেলে
দাঁতে দাঁত লাগল।

বিলক্ষণ রাগ দেখিয়ে
পরমুহূর্তেই শাশুড়ির দাঁত চোখ ঘাড় চোয়াল
যে যার জায়গায় ফিরে এল।
তারপর সারা বাড়িটাকে আঁচড়ে আঁচড়ে
কলতলায়
ঝমর ঝম খনর খন ক্যাঁচ ঘ্যাঁষঘিঁষ ক্যাঁচর ক্যাঁচর
শব্দ উঠল।
বাসনগুলো কোনোদিন তো এত ঝাঁঝ দেখায় না—
বড় তেল হয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে মালাটা দাঁড়িয়ে পড়ল।
নোড়া দিয়ে মুখ ভেঙে দিতে হয়—
মালাটা একবার ঝাঁকুনি খেয়ে
আবার চলতে লাগল।

নাকে অস্ফুট শব্দ ক'রে
থলির ভেতর পাঁচটা আঙুল হঠাৎ
মালাটার গলা টিপে ধরল—
মিন্‌সের আক্কেলও বলিহারি!
কোত্থেকে এক কালো অলক্ষুণে
পায়ে খুরঅলা ধিঙ্গি মেয়ে ধরে এনে
ছেলেটার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।
কেন? বাংলাদেশে ফরসা মেয়ে ছিল না?
বাপ অবশ্য দিয়েছিল থুয়েছিল—
হ্যাঁ, দিয়েছিল!
গলায় রসুড়ি দিয়ে আদায় করা হয়েছিল না?

এবার মালাটাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দেওয়া হল।
শাশুড়ির মুখ দেখে মনে হচ্ছিল
থলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এই সময়ে
কী যেন তিনি লুকোচ্ছিলেন।
একটা জিনিস—
ক'মাস আগে বউমা
মরবার জন্যে বিষ খেয়েছিল।
ভাশুরপো ডাক্তার না হলে
ও-বউ এ-বংশের গালে ঠিক চুনকালি মাখাত।
কেন? অসুখ ক'রে মরলে কী হয়?
ঢঙি আর বলেছে কাকে!

হাতে একরাশি ময়লা কাপড় নিয়ে
কালো বউ
গটগট গটগট ক'রে সামনে দিয়ে চলে গেল।

নাঃ, আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।
'বউমা—'
'বলুন।'
উঁহু, গলার স্বরটা ঠিক কাছা-গলায়-দেওয়ার মতো নয়,
বড্ড ন্যাড়া।
হঠাৎ এই দেমাক এল কোত্থেকে?
বাপের বাড়ির কেউ তো
ভাইফোঁটার পর আর এদিক মাড়ায় নি?

বাড়িটা যেন ঝড়ের অপেক্ষায়
থমথম করছে।
ছোট ছেলে কলেজে;
মেজোটি সামনের বাড়ির রোয়াকে ব'সে
রাস্তায় মেয়ে দেখছে;
ফরসা ফরসা মেয়ে
বউদির মতো ভূষণ্ডি কালো নয়।
বালতি ঠনঠনিয়ে

বউ যেন মা-কালীর মতো রণরঙ্গিণী বেশে
কোমরে আঁচল জড়িয়ে
চোখে চোখ রেখে শাশুড়ির সামনে দাঁড়ালো।

শাশুড়ির কেমন যেন
হঠাৎ গা ছমছম করতে লাগল।
তাড়াতাড়ি থলির মধ্যে হাতটা লুকিয়ে ফেলে
চোখ নামিয়ে বললেন: আচ্ছা থাক, এখন যাও।
বউ মাথা উঁচু ক'রে
গটগট গটগট ক'রে চলে গেল!

তারপর একা একা পা ছড়িয়ে ব'সে
মোটা চশমায় কাঁথা সেলাই করতে করতে
শাশুড়ি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে ভাবতে লাগলেন
বউ হঠাৎ কেন বিগড়ে গেল
তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার।

তারপর দরজা দেবার পর
রাত্রে
বড় ছেলের ঘরে আড়ি পেতে
এই এই কথা কানে এল—

বউ বলছে: 'একটা সুখবর আছে।'
পরের কথাগুলো এত আস্তে যে শোনা গেল না।
খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ,
মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করছিল।
কিন্তু তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার—
বউয়ের গলা, মা কান খাড়া করলেন।
বলছে: 'দেখো, ঠিক আমার মতো কালো হবে।'
এরপর একটা ঠাস ক'রে শব্দ হওয়া উচিত।
ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছে :
'কী নাম দেবো, জানো?
আফ্রিকা।
কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে॥'

ফলশ্রুতি

ফলের দোকানের সামনে
একসময়ে একটা বাঁধা হরিণ
গলার শেকলে টান পড়িয়ে
আড়চোখে এই শহরটাকে দেখত।

কোনোরকম আড়াল না নিয়ে,
কোথাও মাথা না গুঁজে—
সরাসরি আকাশের দিকে মুখ রেখে
দিব্যি চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে ডাকাবুকো রাস্তাটা।

সকাল হলেই
অলিগলি আর গাড়িবাড়ির আড়াল থেকে
কলকল ক'রে বেরিয়ে পড়ত মানুষ;
তারা সামনে দিয়ে হনহনিয়ে যেত—
নিশ্চয় শিকারে।

বাসগুলো মোড় নিত হুমহাম শব্দে;
তাদের বন্ধ খাঁচায় গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ করত
ছোট ছোট বাঘের বাচ্চা,
ট্রামগুলো চলে গেলেই
তারের খেলা দেখাতে দেখাতে যেত
ছুরিতে শান দেবার একটানা হিসহিস শব্দ।
ফুটপাথের কোলের কাছে কোথাও
তৃষ্ণার জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ত খাদে—
সামনে একটা থাম থাকায় দেখা যেত না।
মাঝে মাঝে হাওয়ায় উড়ে আসত বিড়ির পাতা—
তাতে নানা মাপের জানলা-দরজা ফোটানো;
তার ভেতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এ শহরকে দেখতে চাইত
দূরের এক ঘোমটা দেওয়া অরণ্য।

ফলের দোকানের সামনে দিয়ে আসতে যেতে
লোকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ত—
বাঃ, কী সুন্দর!

দেখো, দেখো ঠিক ছবির মতন!
হরিণটা মুখ বিষ ক'রে তাকাত।
সুন্দর? মরণ আর কি! তার দাঁত কড়মড় করত।
গলায়-শেকল-পরানো এই পোষা প্রভুভক্ত 'সুন্দর' শব্দটা
তার কিছুতেই আর বরদাস্ত হচ্ছিল না।
তার নাকের কাছে ঘোরাফেরা করছিল একটা আঁশটে সন্দেহ
শহর-বসানো এই অরণ্যের ভেতরে ভেতরে
আসলে খুব হিংস্র একটা ব্যাপার চলেছে।
মানুষ মানুষকে আর
মানুষকে মানুষ এখানে শিকার করছে,
কিন্তু রক্তের কোনো দাগ কোথাও রাখা হচ্ছে না।
'বাঃ, কী সুন্দর' বলে একটা দারুণ নিষ্ঠুরতাকে চাপার চেষ্টা চলেছে।

বাঁধা হরিণের মনে হল
এর চেয়ে ঢের ভাল হত যদি তার প্রাণ-হাতে-করা সৌন্দর্য
মানুষ জঙ্গলে দাঁড়িয়ে একাগ্র লক্ষ্যে ধনুকে টঙ্কার তুলে দেখত।
ঢের ভাল ছিল সেই অকপট স্থূল ব্যবহার
আগুনে চড়ে
যা রসনায় গিয়ে মানুষকে তবু যা-হোক হৃষ্টপুষ্ট করত।
সন্দেহটা চারিদিকে ক্রমশ পচতে থাকায়
হরিণের মুখে
পয়সা দিয়ে কেনা ঘাস আর রুচল না—
ঠোঁটের সামনে
যেমন তেমনি উপুড় হয়ে রইল।

শেষে একদিন
গলার শেকল খুলে রেখে
সেই হরিণকে
নড়বড়ে লোহার চাকাওয়ালা একটা গাড়ির ঘাড়ে চড়ে
ড্যাডাং-ড্যাং-ড্যাডাং-ড্যাং শব্দে
ঠ্যাং আকাশে আর চোখ কপালে তুলে
মহানন্দে এই শহরের বাইরে চলে যেতে দেখা গেল॥

ছেই

ভাজা ইলিশের গন্ধে গলি ছেড়ে কিছুতেই নড়তে চায় না হাওয়া।
বুড়োরা গিয়েছে পার্কে ক্ষিধে করতে। পাঁচিলে বেড়াল দিচ্ছে ডন;
কেননা আল্‌সেয় কাক। গালে হাত দিয়ে ভাবছে এক বোকা হাবা—
হায়, মেয়েটির আজ পাকা-দেখা! পাত্র কিনল মেড-ইন-লণ্ডন।
হাতে আরশি। গোঁফ ছেঁটে বাবু দেন আপনাকে আপনি বাহাবা।
রাস্তায় রজনীগন্ধা হেঁকে যাচ্ছে। কেনো ফুল এক-আধ ডজন।
রোয়াকে বসেছে আড্ডা পুরোদমে। আজ কিন্তু চা শুধু, টা নেই।
আকাশটা দেখা যায় না; দেখা গেলে মনে পড়ত কবিতা-টবিতা।
দমকল পুরুত গেল ঘণ্টা নেড়ে! কিছু একটা ঘটেছে কাছেই।
এখনও পোকায় খায়নি ট্রাঙ্কে তোলা তার সেই সুন্দর ছবিটা।
ঠিকে-ঝি বাসন মেজে চলে গেছে। কলে জল পড়ছে তো পড়ছেই,
চোখের জলের মতো। হায়, আজ পাকা-দেখা। অমনি পাকা গিন্নি পৃথিবীটা
শাড়ির আঁচলে হাওয়া নেড়ে দিয়ে বলে উঠল—ছেই-ছেই-ছেই॥

দূর থেকে দেখো

আমি আমার ভাবনাগুলোকে
চামচে ক'রে নাড়তে থাকব—
অন্য কোনো টেবিল থেকে তুমি শুনো।

সামনে দাঁড় করানো থাকবে কাপ
আমার কোলের ওপর দুটো আঙুল
কুরুশকাঠির মতো বুনবে
স্মৃতির জাল—
তুমি অন্য কোনো টেবিল থেকে দেখো।

তারপর
যখন জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে সময়
চেয়ারে শব্দ ক'রে আমি উঠে পড়ব
পেছনে একবারও না তাকিয়ে
আমি চলে যাব
যেখানে বাড়িগুলোর গায়ে
চাবুক মারছে বিদ্যুৎ
যেখানে গাছগুলোকে চুলের মুঠি ধরে

মাটিতে ফেলে দিতে চাইছে হাওয়া
যেখানে বন্ধ জানলায় নখ আঁচড়াচ্ছে
হিংস্র বৃষ্টি।

তুমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো।।

এই পথ

চোখে চোখ পড়তে

পুরনো বন্ধুত্ব
একটু হেসে
হাত নেড়ে চলে গেল।

কাঁচের গায়ে চোখ রেখে
পেছনে ফিরে একবার চাইলেই
দূর থেকে দেখতে পেত—

ময়রার দোকানের
কান-বেঁধানো এক উটকো শালপাতা
একটা মধুর স্মৃতি ঠোঁটে ক'রে নিয়ে
ডানাভাঙা পাখির মতো
একটু উড়তে চেষ্টা করেছিল

তাকে জুতোর তলায় চেপে,
চারিদিকে তাকিয়ে,
ভাল ক'রে গাড়িঘোড়া দেখে
তারপর খুব সাবধানে
আমি রাস্তা পার হলাম।

২
বুড়োধাড়ি গাছ

যেন কোমরে ঘুনসি বেঁধে
দিগম্বর সেজে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাঙা জং-ধরা লোহার বেড়াটার গায়ে
দড়ির আগুনে
নিভে-যাওয়া সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে
হাসি পেল।

একদল লোক হরিবোল দিতে দিতে
খই ছড়িয়ে গেছে রাস্তায়
একদল কাক তাই
খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

৩

কলের জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে—

ছলাৎ চ্ছল ছলাৎ চ্ছল
ঝাঁঝরিতে জল পড়ার শব্দ।

মাথার ওপর একটানা দীর্ঘ তারে
ছড় টেনে
ঝড়ের সুর বাজাতে বাজাতে গেল
একটা মন্থর ট্রাম!

তারপর আবার ছলাৎ চ্ছল ছলাৎ চ্ছল
জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে
ঝাঁঝরিতে।

৪

আমি আজও ভুলি নি

সামনে-পেছনে সশস্ত্র পাহারা
আকাশ পত্রজালে ঢাকা
আমরা বন্দীর দল
পাথরে পা টিপে টিপে উঠছি।

হঠাৎ আমরা কথা বন্ধ করলাম

তারপর কান পেতে শুনতে লাগলাম
স্তব্ধ পাহাড়ে
ছলাৎ চ্ছল ছলাৎ চ্ছল
এক অদৃশ্য ঝর্নার শব্দ।

একটা ঘুড়ি কেটে এসে পড়তেই
রাস্তায় খুব হল্লা হল।
পুলিশের কালো গাড়ি এসে থামতে
কে একজন পেছন থেকে বলল—

মিছিল এই পথ দিয়েই যাবে।।

মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ

১

আরে! মুখুজ্যে মশাই যে! নমস্কার, কী খবর?
আর এই লেখা-টেখা সংসার-টংসার এই নিয়েই ব্যস্ত।
তা বেশ। কিন্তু দেখো মুখুজ্যে,
আমার এই ডানদিকটাকে বাঁদিক
আর বাঁদিকটাকে ডানদিক ক'রে
আয়নায় এভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া—
আমি ঠিক পছন্দ করি না।
তার চেয়ে এসো, চেয়ারটা টেনে নিয়ে
জানলায় পা তুলে বসি।
এককাপ চায়ে আর কতটা সময়ই বা যাবে?

দেশলাই? আছে।
ফুঃ, এখনও সেই চারমিনারেই রয়ে গেলে।
তোমার কপালে আর ক'রে খাওয়া হল না দেখছি।
বুঝলে মুখুজ্যে, জীবনে কিছুই কিছু নয়
যদি কৃতকার্য না হলে।

২

আকাশে গুড়গুড় করছে মেঘ—

ঢালবে।
কিন্তু খুব ভয়ের কিছু নেই;
যুদ্ধ না হওয়ার দিকে।
আমাদের মুঠোয় আকাশ;
চাঁদ হাতে এসে যাবে।

ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টির,
অন্ধকারের চেয়ে আলোর দিকেই
পাল্লা ভারী হচ্ছে।

ঘৃণার হাত মুচড়ে দিচ্ছে ভালবাসা।
পৃথিবীর ঘর আলো ক'রে—
দেখো, আফ্রিকার কোলে
সাত রাজার ধন এক মানিক
স্বাধীনতা।
পাজির পা-ঝাড়াদের আগে যারা কুর্নিশ করত
এখন তারা পিস্তল ভরছে।
শুধু ভাঙা শেকলগুলো এক জায়গায় জুটে
এই দিনকে রাত করবার কড়ারে
ডলারে ফলার পাকাবার
ষড়যন্ত্র আঁটছে।

পুরনো মানচিত্রে আর চলবে না হে,
ভূগোল নতুন ক'রে শিখতে হবে।
আর চেয়ে দেখো,
এক অমোঘ নিয়মের লাগাম-পরা
ঘটনার গতি
পাঁজির পাতায় রাজজ্যোতিষীদের
দৈনিক বেইজ্জত করছে।

ধনতন্ত্রের বাঁচবার একটাই পথ
আত্মহত্যা।
দড়ি আর কলসি মজুত
এখন শুধু জলে ঝাঁপ দিলেই হয়।

পৃথিবীকে নতুন ক'রে সাজাতে সাজাতে
ভবিষ্যৎ কথা বলছে, শোনো,
ক্রুশ্চভের গলায়।

নির্বিবাদে নয়, বিনা গৃহযুদ্ধে
এ মাটিতে
সমাজতন্ত্র দখল নেবে।
হয়ত একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে
কিন্তু যখন হবে
তখন খাতা খুলে দেখে নিও
অক্ষরে অক্ষরে সব মিলে যাচ্ছে।

৩

দেখো মুখুজ্যে, মাঝে মাঝে আমার ভয় করে
যখন অমন সুন্দর বাইরেটা
আমার এই আগোছালো ঘরে হারিয়ে যায়।

যখন দেখি ঠিক আমারই মতন দেখতে
আমার দেশের কোনো ভাই
উলিঝুলি ছেঁড়া কাপড়ে
আমাকে কাঁদাতে পারবে না জেনেও
ব'লে ব'লে দুঃখের কথাগুলোতে ঘাঁটা পড়ায়—
আমার লজ্জা করে।

পাঞ্চেতের এক সাঁওতাল কুলি দেখতে দেখতে
ওস্তাদ ঝালাইমিস্ত্রি হয়েছিল—
এখন আবার তাকে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে পেটভাতায়
পরের জমিতে আদ্যিকালের লাঙল ঠেলতে হচ্ছে।
এক জায়গায় রুগী ডাক্তার অভাবে মরছে,
অন্য জায়গায় ডাক্তার রুগী অভাবে মরছে।
কেন হয়?
কেন হবে?

আমি দেখে এসেছি নদীর ঘাড় ধরে
আদায় করা হচ্ছে বিদ্যুৎ—

ভালো কথা।
কলে তৈরি হচ্ছে বড় বড় রেলের ইঞ্জিন—
খুব ভালো।
মশা মাছি সাপ বাঘ তাড়িয়ে
ইস্পাতের শহর বসেছে—
আমরা সত্যিই খুশি হচ্ছি।

কিন্তু মোটেই খুশি হচ্ছি না যখন দেখছি—
যার হাত আছে তার কাজ নেই,
যার কাজ আছে তার ভাত নেই,
আর যার ভাত আছে তার হাত নেই।

তবু যদি একটু পালিশ থাকত।
তা নয়,
মুচির দোকানের লাশে-চড়ানো জুতোর মতো
মাথার ওপর ঝুলছে।

গদিতে ওঠবস করাচ্ছে
টাকার থলি।
বন্ধ মুখগুলো খুলে দিতে হবে
হাতে হাতে ঝনঝন ক'রে ফিরুক।
বুঝলে মুখুজ্যে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না
আড় হয়ে লাগতে হবে।

৪

যারা হটাবে
তারা এখনও তৈরি নয়।
মাথায় একরাশ বইয়ের পোকা
কিলবিল' করছে:
চোখ খুলে তাকাবার
মন খুলে বলবার
হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখবার—
মুখুজ্যে, তোমার সাহস নেই।

আগুনের আঁচ নিভে আসছে
তাকে খুঁচিয়ে গনগনে ক'রে তোলো।
উঁচু থেকে যদি না হয়
নীচে থেকে করো।

সহযোদ্ধার প্রতি যে ভালোবাসা একদিন ছিল
আবার তাকে ফিরিয়ে আনো;
যে চক্রান্ত
ভেতর থেকে আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে
তাকে নখের ডগায় রেখে
পট্ ক'রে একটা শব্দ তোলো॥

দরজা খুলে দাও,
লোকে ভেতরে আসুক।

মুখুজ্যে, তুমি লেখো॥

কাল মধুমাস

আকৈশোর আমার কবিতার অক্লান্ত পাঠক

রমাকৃষ্ণ মৈত্র

বন্ধুবরেষু

তোমাকে বলিনি

আকাশে তুলকালাম মেঘে
যেন বাজি ফোটানোর আওয়াজে
কাল তোমার জন্মদিন গেল।

ঘরে বৃষ্টির ছাঁট এলেও
জানলাগুলো বন্ধ করি নি—
আলো-নেভানো অন্ধকারে
থেকে থেকে ঝিলিক-দেওয়া বিদ্যুতে
আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তোমার মুখ।

আর মাঝে মাঝে
হাওয়া এসে নড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিল
তোমাকে ভালোবেসে দেওয়া
টেবিলে রাখা
গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল।

কাল কেন আমি ঘুমোতে পারিনি
তোমাকে বলিনি—

আমাব ফেলে-দেওয়া লেখার কাগজটা নিয়ে
শয়তান বেড়ালটা
কাল সারা রাত খেলেছে।

তোমাকে বলিনি—
দজ্জাল ঘড়িটা
একদিন আমাকে বাজিয়ে দেখে নেবে ব'লে
টিকটিক শব্দে শাসিয়েছে।

তোমাকে বলিনি—

মাটিতে মিশে যাবার পর
আমরা দুজনে কেউই কাউকে চিনব না।

আর দেখ,

তোমাকে বলাই হয়নি
এবার রথের মেলায়
কী কী কিনব—

মেয়ের জন্যে তালপাতার ভেঁপু
তোমার জন্যে ফলফুলের চারা
আর বাড়ির জন্যে
সুন্দর পেতলের খাঁচায়
দুটো বদ্‌রিকা পাখি॥

জলছবি

ক্যালেণ্ডারে হাত দিস নে,
যা ভাগ্‌, বোকা হাবা!

চেয়ার খালি। জানলা খোলা।
নিরক্ষর হাওয়া
বারে বারে একই বইয়ের
ওলটাচ্ছে পাতা।

ঘড়ির কাঁটায় হাত দিস নে,
সময় গোনাগাঁথা।

বারান্দায় ফুলের টব,
মেঝেয় ছাড়া চটি,
ব'সে ব'সে শুঁড় নাড়াচ্ছে
মাটির প্রজাপতি।

টেবিলঝাড়া পাখির-পালক
ঘরের মধ্যে ওড়ে
খাটের তলায় ছেঁড়া চিঠিটা
বেড়ায় ন'ড়ে-চ'ড়ে।

পা আকাশে, হাত নামানো—
রেলিঙে সার বেঁধে
শুকোয় কাপড়। রঙিন ঘুড়ি
তারে রয়েছে বেধে।

আলো নেভানো। চোখ বন্ধ।
দেখতে পাচ্ছি সবই।
কাঠের বাক্সে পোকায় কাটছে
পুরনো গ্রুপছবি।

একটিবার দৌড়ে এসো
ও নদী, ও স্মৃতি—
ঘরের এই দেয়াল ধ'রে
দাঁড়াও না, লক্ষ্মীটি।

দরজায় কে পর্দা ঠেলছে?
বাইরে যাই। ফিরি।
পায়ের শব্দে নেমে যাচ্ছে
অন্ধকার সিঁড়ি॥

দ্বৈপায়ন

একাকিত্বের সমাহার? নাকি—
সমাহৃত একাকিত্ব?
একে একে দুই, অথবা একের
মধ্যেই আছে দ্বিত্ব?
বন না বৃক্ষ? ঘুরে ফিরে শেষে
আজও সেই একই বৃত্ত॥

নিশান

আমার স্মৃতিতে দুলে দুলে
দুলে দুলে
সারাক্ষণ
দুলে দুলে

নিশান
দুলে দুলে

নিশান
দুলে দুলে

সারাক্ষণ আমার স্মৃতিতে

নাচছে॥

খোলা দরজার ফ্রেমে

টেবিলের ওপর ফাটলধরা পাথরটায়
একবাক্স দেশলাই
একরাশ ছাই
আর বিস্তর ধোঁয়াটে কথা

ফেলে ছড়িয়ে রেখে

তিনজন ছোকরা উঠে চলে গেল

আড়ালটা স'রে যেতেই
সামনে
খোলা দরজাটার ফ্রেমে
কিছুটা স্থির, কিছুটা অস্থির
একটা ছবি ফুটে উঠল—

আল্‌সেয় ব'সে
মুখে কুটো নিয়ে একটা বুড়ো শালিখ
ঘাড়ের রোঁয়া বার ক'রে
চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে

ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি যাচ্ছে দেখ,
ল্যাম্পপোস্টে
দেখ, ফাঁসি যাচ্ছে
পুরোনো বিজ্ঞপ্তির ছেঁড়া চাটাই

তার নীচে
গদিতে বহালতবিয়তে ব'সে

পাগড়ি-বাঁধা একটা লোক
গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গেল
রাস্তায় টহলদার
একঠো বঢ়িয়া মাল

মাথার ওপর লম্বা একটা লাঠি উঁচিয়ে
কোলে-পো কাঁখে-পো হয়ে
একটা ট্রাম
তার পেছন পেছন
তেড়ে গেলে
তারের গায়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ঝুলে থাকল
একটা একটানা
ছি
ছি
শব্দ

টেবিলটা মুছতে মুছতে
বয়
দেশলাইটা নাড়াতেই
ভেতরের কাঠিগুলো ঝম ঝম ক'রে উঠল—
আজকালকার ছেলেদের এই আরেকটা দোষ
বড্ড ভুলে যায়

একটা দোতলা বাস
একটু দাঁড়িয়ে
জানলায় একটা মিষ্টি মুখ দেখিয়ে নিয়ে চলে গেল

আল্‌সেয় আর সেই শালিখটা নেই

ল্যাম্পপোস্টে তখনও
সমানে ফাঁসি যাচ্ছে
পুরোনো বিজ্ঞপ্তির ছেঁড়া চাটাই

তার নীচে
অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে একটা লোক
সাদা পোশাকের পুলিশ

না পকেটমার—
বার বার দেখেও ঠাহর করতে পারলাম না

হুঁশ হল
তিনজন মাঝবয়সী লোক
ল্যাম্পপোস্টটাকে আড়াল ক'রে
সামনের টেবিলে এসে বসেছে

টেবিলে আবার একটা দেশলাই
দূরে ল্যাম্পপোস্ট

এবার ধাড়ি লোকগুলো ভুলে যায় কিনা
দেখবার জন্যে
আমি আরেক কাপ চা চাইলাম॥

শূন্য নয়

লাবণ্য, একবার তুমি চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাবে মাথার ওপর
শূন্যতা কেবলমাত্র শূন্য নয়; চাঁদ সূর্য গ্রহ তারা শূন্যে বাঁধে ঘর,
আলো বাঁধে ঘর দেখো অন্ধকারে; দুই তীর দিয়ে বাঁধে নদীও নিজেকে
সমুদ্রে পড়ার আগে। জীবনের সেই এক বৃত্তে ঘুরি আমরা প্রত্যেকে।
জন্মেই মৃত্যুর চিন্তা, প্রেমে জাগে বিচ্ছেদের ভয়, পদে পদে ভুলভ্রান্তি,
অথচ জীবন তার চেয়ে বড়ো, ঢের ঢের বড়ো; শিশিরবিন্দুর শান্তি
ঘাসের ডগায় দোলে, পুলকিত পত্রগুচ্ছ বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে
হাত নেড়ে বলে: বাঁধো, নীড় বাঁধো; লাবণ্য, একবার তুমি তাকাও আকাশে॥

এই মিছিল এই রাস্তা

ওরা ভেবেছিল আমরা রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।
আমরা দাঁড়ালাম
ভাঙাকে জোড়া দেওয়া এই সুদূরপ্রসারী মিছিলে।

ওরা ভেবেছিল আর আমাদের কিছুই থাকল না।
মুঠো করতেই
খালি হাতগুলো আমাদের ভ'রে গেল।

ওরা ভেবেছিল দিনকে রাত করতে পারবে।
আমাদের লাল নিশানে
রাতকে দিন করার শপথ গর্জে উঠল।
ডেকে ডেকে আমরা বললাম:
ভুল রাস্তায় এখনও যারা ঘুরছ
যারা এখনও ভুল বুঝছ
ভাইবন্ধুরা আমাদের—
এসো।

দেখ, এই মিছিল
এই রাস্তা॥

ভুবনভাঙার বাউল এক

যেন
উলানোভার মরালনৃত্যের ভঙ্গিতে

শিয়রে
শুভ্র ফুল—

ভুলু হাসছিল।

ভুলো না, মনে রেখো...
দাস্‌ভিদানিয়া!
লক্ষ্মীটি, এসো আবার...
দাস্‌ভিদানিয়া!
এসো কিন্তু, ঠিক এসো...
দাস্‌ভিদানিয়া! দাস্‌ভিদানিয়া!

•

তার হাতের উষ্ণতা
এখনও সেই বিদায়-নেওয়া বন্ধুদের হাতে—
ক্রেমলিনের লাল তারার চোখে চোখ রাখা
শার্সিগুলোর গায়ে
তার গেয়ে আসা গান এখনও গমগম করছে;
পার্কের মাটিতে তার পুলকিত পদচিহ্ন

বরফ না পড়া পর্যন্ত থাকবে।

ভুলু হাসছিল।

প্রার্থনা শেষ ক'রে গান ;
গান শেষ ক'রে
জনাকীর্ণ ঘরে উঠোনে রাস্তায়
স্নেহ প্রেম প্রীতি সখ্য
চোখের শূন্যতাকে
সযত্নে স্মৃতির কোলে তুলে দিল

লাল মাটির ধুলো উড়িয়ে
হাতে একতারা নিয়ে
ঘুঙুর-পায়ে বাউল হাওয়া
আনন্দে নাচতে নাচতে
চলে গেল...

যেদিকে খোয়াই
যেদিকে শালবন

যেখানে জননী
যেখানে জন্মভূমি॥

লাল গোলাপের জন্যে

আমারও প্রিয় রং লাল;
আমারও প্রিয় ফুল
গোলাপ।

আমি লড়ছি
লাল গোলাপের জন্যে।

চেয়ে দেখ,
আসমুদ্রহিমাচল
শোকস্তব্ধ আমাদের ভালোবাসা
নতমুখে
উদ্ভিন্ন মাটির দিকে তাকিয়ে।

শৃঙ্খলের ক্ষতগুলো
ভালো ক'রে আজও শুকোয় নি;
প্রাণের সব তার
এক সুরে এখনও বাঁধা হয় নি;
সর্বনাশের কিনার থেকে
পৃথিবী
বরাবরের মতো এখনও স'রে আসে নি।

চষা মাটির মতো এবড়ো খেবড়ো সময়;
চলতে কষ্ট হলেও
জানি, তার গর্ভে ছড়ানো আছে বীজ।
আশাহত অবুঝ অশান্ত
আমাদের আজকের অভিমানগুলো
চোখের জল ফেলে
নবান্নের উৎসব করবে।
চোখে নয়,
এখন আমাদের বুকের মধ্যে লাল গোলাপ—
বুক দিয়ে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

আমার প্রিয় রং লাল;
আমার প্রিয় ফুল
গোলাপ।

লাল গোলাপের জন্যে
সাহসে বুক বেঁধে
এখন আমাদের লড়াই॥

ছি-মন্তর

লাগ লাগ লাগ ভেল্‌কি।
চাল-চিনি-মাছ তেল-ঘি॥
ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি খিড়কির দোরে।
চোর নিয়ে যায় পুলিশ ধ'রে॥
ওঁ হ্রীং স্বাহা ওয়াগন ফট্‌।
যে বেটা নজর দিবি সে বেটা হট্‌॥

কানামাছি ভোঁ ভোঁ।
ছুঁয়ে দিয়েছি ঘোষের পো॥
দিল্লি থেকে ছাড়লাম ডাক।
যেইখানের ধনী সেইখানেই থাক॥

লাগ লাগ লাগ ভেল্‌কি।
হুকুমতের খেল্‌ কী॥
বাড়লে বেশি বাতচিত।
সদাচারের সৎ চিৎ॥

কুকুর ইঁদুর মাছি ফুলের-গাছ

পর্দাটা উসখুস করছে হাওয়ায়
যেন কেউ
আসবে কি আসবে না ভাবছে।

নীচে কারো চেনে-বাঁধা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।
মশারির দড়িতে কয়েকটা মাছি,
ইঁদুরগুলো আলমারির আড়ালে অদৃশ্য
বারান্দায় সারবন্দী টবে
ফুলের গাছ।

ইলেক্‌ট্রিক পাম্পে ঝিঝি-লাগা ফ্ল্যাটবাড়িটা।
যেন মহাশূন্যে ঝুলছে।
দেয়ালে
ঘড়ির কাঁটায় বিদ্ধ সময়;
সমস্ত ভার হারিয়ে ফেলে আমি যেন ভাসছি।

পাম্পের শব্দ হঠাৎ থেমে গেলে
বাইরে এসে দাঁড়ালাম।
আমাদের এই শুক্‌নো খট্‌খটে রাস্তায়
কয়েকটা গাড়ি
ভিজে পায়ে
জলের দাগ বুলিয়ে চলে গেল।
জামাটা গায়ে গলিয়ে

ছুটে গিয়ে একবার দেখে এলে হত—

ঠিক কত দূরে
আশ্বিনের কানা মেঘ
এই পৃথিবী ছেড়ে আর কোথাও
যাবে কি যাবে না এই দ্বিধায়
রোদ আর বৃষ্টি দিয়ে
নিজেকে দু-ভাগ করছে॥

সকালের ভাবনা

দুধের গাড়িটা মোড় ঘুরতেই
পাশের বাড়ির ছাদে
মোরগগুলো ডেকে উঠল।

অন্ধকারকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে
সকালের প্রথম ট্রামও
এক্ষুনি যাবে।

তারপরই চলন্ত সাইকেলে
দু-পাশের গাড়িবারান্দায়, রেলিঙে, ফুলের টবে,
ঘরের মেঝেয়
গালে চড় মারবার শব্দে
সকালের কাগজগুলো
ঠাস্ ঠাস্ ক'রে
পড়তে থাকবে।

রাত্রে জানলা বন্ধ করতে গিয়ে ভেবেছি
মাঠে ধান্য দাঁড়িয়ে;
এখন বৃষ্টি হওয়াটা ভয়ের।

কাল দিনটা কেমন গেছে
ছাপার হরফে
একটু বাদেই জানতে পারব।
আজকের দিনটার মনে কী আছে

এখনও জানি না।

হাত মুঠো করছি
আর খুলছি।
মুঠো করছি
আর খুলছি।

যে দিনটাকে আমি চাই
কিছুতেই মিলছে না॥

পারঘাটের ছবি

এপারে গিলে ওপারে ওগ্‌রাবে।

এমনি ক'রে ফেরির লঞ্চে
উদয়াস্ত
দুই পারের যেন দু-হাতে
আপন মনে
নিরন্তর
    ঢাল-উপুড়
        ঢাল-উপুড় খেলা।

মাঝনদীতে জল ঘোলাচ্ছে
        মাটি-কাটার জাহাজ।
মধ্যে মধ্যে দোলাচ্ছে মন
গেরুয়া-রং ঢেউ।

ধানের কী দর?
ভজ গোবিন্দ!
আসেন বাবু, ভালো হোটেল।
ভজ গোবিন্দ!
আসেন।

চা পান বিড়ি
সবেদা কলা
কাঁঠাল আম মুরগি মাছে
জমে উঠেছে ফেরিঘাটের বাজার।

ঝোলানো ব্যাগ। পোঁটলা-পুঁটলি। টিনের সুটকেসে
পড়ার বই,
সিঁদুরকৌটো,
মেলায় তোলা ফটো,
গলার কণ্ঠী, পুরনো তাস,
কাঁথা এবং আদালতের নথি।

নাচতে নাচতে আসছে লঞ্চ।
নাচতে নাচতে যাবে।

এপারে গিলে পুরো ছবিটা
ওপারে ওগ্‌রাবে॥

মর্সিয়ার পর

রাস্তায় লাইনবন্দী শোক
রাস্তায় লাইনবন্দী শোক

মিছিল
যেন ফুরোতে চায় না

আগে আগে
          আগে আগে
মুখ নিচু করে আছে
দুলদুল

পিঠে সওয়ার নেই
পিঠে সওয়ার নেই

পেছনে থেমে থেমে
থেমে থেমে
মহরমের বাজনা

হায়-হাসান হায়-হোসেন
হায়-হাসান হায়-হোসেন ব'লে
বুক বাজাতে বাজাতে চলেছে আমার ভাই

আর আমি
ঠা ঠা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দেখছি

মাটির ফুটো সরা থেকে
ফোঁটা ফোঁটা
জলে
নিষ্পত্র মরা ডালে
চুঁইয়ে চুঁইয়ে
        চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে—

নতুন জীবনের
বীজমন্ত্র॥

কাছের লোক

দরজা খোলো,
ফিরে এসেছি—
ফিরে এসেছি দেখ।

দূরে গিয়েছি
দূরে থাকি নি
ফিরে এসেছি দেখ।

কাছে থাকব
দূরে গেলেও
কাছে থাকব
দূরে গেলেও

ফিরে এসেছি দেখ।

দরজা খোলো,
ফিরে এসেছি—
দরজা খোলো
ফিরে এসেছি
দরজা খুলে ডাকো॥

জননী জন্মভূমি

আমি ভীষণ ভালবাসতাম আমার মা-কে
—কখনও মুখ ফুটে বলিনি।
টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে
কখনও কখনও কিনে আনতাম কমলালেবু
—শুয়ে শুয়ে মা-র চোখ জলে ভ'রে উঠত
আমার ভালোবাসার কথা
মা-কে কখনও আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি।

হে দেশ, হে আমার জননী—
কেমন ক'রে তোমাকে আমি বলি।

যে মাটিতে ভর দিয়ে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি—
আমার দু-হাতের
দশ আঙুলে
তার স্মৃতি।

আমি যা কিছু স্পর্শ করি
সেখানেই,
হে জননী,
তুমি।
আমার হৃদয়বীণা
তোমারই হাতে বাজে।

হে জননী,
আমরা ভয় পাই নি।
যারা তোমার মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা বাড়িয়েছে
আমরা তাদের ঘাড় ধ'রে
সীমান্ত পার ক'রে দেব।
আমরা জীবনকে নিজের মতো ক'রে
সাজাচ্ছিলাম—
আমরা সাজাতে থাকব।

হে জননী,
আমরা ভয় পাই নি।

যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেছে ব'লে
আমরা বিরক্ত।

মুখ বন্ধ ক'রে,
অক্লান্ত হাতে—
হে জননী,
আমরা ভালোবাসার কথা ব'লে যাব॥

এদিকে

ওদিকে প্রচণ্ড তর্ক,—'এটা ঠিক', 'না, এইটে ঠিক' ব'লে।

ঘন ঘন উঠছে নামছে তাপমানযন্ত্রের পারদ।
কিছু তালেবর লোক তাল বুঝে কত্তালে শ্রীখোলে

'লেগে-যা', 'লেগে-যা' বোলে রব তুলছে: নারদ! নারদ!

এদিকে রাস্তার জল ভাসতে ভাসতে রসাতলে নামে।
চলে যাচ্ছে টলতে টলতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঝাঁঝরিতে
কাগজের নৌকোগুলো। হা হতোস্মি! দক্ষিণে ও বামে।
ছিঁড়ে খাচ্ছে শুঁড়ি ছুঁড়ি গনৎকার পুরুত পাদরিতে।

ব্যস্, এ কোরাস শেষ॥
'আমার এ গল্পের নায়ক
কুমোরটুলিতে থাকত; যতই সে বানাত প্রতিমা
লোকে ফেলে দিত জলে,—বারোমাস এই বাঁধা ছক॥
একদিন ধুত্তোর ব'লে স'রে পড়ল গায়ে দিয়ে নিমা
পাশের গলিতে,—যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে সুশীলা-ফুসিলা—

ভাল ক'রে নেড়ে চেড়ে দেখল ভারি সুন্দর বানানো
ঈশ্বরের জীব।

ফিরে এসে বানাল সে পুতুল রঙ্গিলা।
খুব কাটল। উপরন্তু যত্নে রইল ঘরে ঘরে। জানো?'

রামো রামো!
          শেষে কিনা এই গপ্প?
                                  —ও হে, ব'সে পড়ো!
বুঝেছ? আদতে দোষটা হল গিয়ে চোখের ঠুলির—
কেননা সমস্যাগুলো ওর চেয়ে ঢের ঢের বড়ো।

পৃথিবীর মানচিত্রে নামও নেই কুমোরটুলির॥

আসলে যে চরিত্রটা নিয়ে এত কাণ্ড, এত গলাবাজি—
সে কিন্তু সমস্ত বোঝে।
                    এবং সে
                                  বাজারেও যায়
থলি হাতে।
              পৃথিবীকে ঢেলে সাজতে সেও খুব রাজি

ভোর হবে। তাই এত অন্ধকার ব্যথায় মোচড়ায়॥

ফোঁটা

ভাই আমাকে বকুক ঝকুক
        দিক গে যতই খোঁটা—
যমের দুয়োরে কাঁটা দিচ্ছি,
        ভাইয়ের কপালে ফোঁটা।

ভাইয়ের সঙ্গে আড়ি আমার,
        ভাইয়ের সঙ্গে ভাব—
সেলাই করি তারই মাপে
        রাজার কিংখাব।

কাঠ কুড়োচ্ছি বনে,
ভাই রয়েছে রণে—
নিজের হাতে বেঁধে দিয়েছি
        তরোয়ালের খাপ।

ভাইয়ের হাতে সেই সে অসি

ঝলমল করে!
অন্ধকারের সিংহাসন যে
টলমল করে!

দিনের স্মৃতি বুকে রেখেছি,
স্বপ্ন চোখের কোলে—
কখন যে ভাই ঘরে ফিরবে
ঘুমে পড়ছি ঢ'লে।

ফুল তুলেছি বনে,
দেখে রেখেছি কনে—
হাত পুড়িয়ে রেঁধে রেখেছি
ভাইকে দেব ব'লে।

শেকলগুলো ভাঙছে কোথায়
ঝন্ ঝন্ ক'রে!
নিশান ওড়ে, রথের চাকা
বন্ বন্ ঘোরে!

ভাই এনেছে লক্ষ্মীর ঝাঁপি,
খুলে ফেলেছে ডালা
দেখ ও ভাই, তোমার জন্যে
গেঁথে রেখেছি মালা।

ভাই আমাকে নাই বা দেখুক,
মারুক লাথি ঝাঁটা—
ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়োরে কাঁটা॥

ভুলে যাব না

চায়ের দোকান।
তুমুল তর্কে
চিড় খাচ্ছে টেবিল।
হঠাৎ আওয়াজ।
মাটিতে পা;

হাত আকাশে। মিছিল।

দৃষ্টি বদল।
হাতে বেঁধেছ
হাত। করেছ ঋণী।
ভুলে যাইনি।
ভুলে যাব না
জীবনে কোনোদিনই॥

পাড় ভাঙছে।
ছইয়ের ভেতর
আলো দুলছে। হাওয়া।
সকাল বেলায়
ডাঙায় পৌছে
বন্দরে চা খাওয়া।

গলা মিলিয়ে
গেয়েছি গান--
'মা আমার বন্দিনী'।
ভুলে যাইনি।
ভুলে যাব না
জীবনে কোনোদিনই॥
এপারে ঘর।
ওপারে ঘর।
মধ্যে কঠিন দেয়াল।
ভোজের পাত
পেতে রেখেছে
ধুরন্ধর শেয়াল।

শুকনো মুখে
বলেন মা, 'কী
পেলাম বল্ দিনি?'
ভুলে যাইনি।
ভুলে যাব না
জীবনে কোনোদিনই॥

কালো বেড়াল

একগাদা লোক পুকুরে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে
মাছ-ধরা দেখছিল।
ট্রাম থেকে লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে
নিজেকে আমি সামলে নিলাম।
বেলা ব'য়ে যাচ্ছে—
পা চালিয়ে, ভাই!

পা চালিয়ে।

শো-কেসের জানলায় নিজের ছায়াটাকে লট্‌কে
একটু নেড়ে-চেড়ে
দেখে নিলাম—
এককালে যা শোভা পেত
এখন আর তা শোভা পায় না।

পেছন থেকে কেউ আমার নাম ধ'রে ডাকল—
আমি নই।
আজ কেউ তরুণ গলায়
আমার নাম ধ'রে ডাকবে না।

মনুমেন্টের নীচে সভা।

সভা নয়—
দাঁত তোলার আগে বক্তৃতা দিচ্ছে
ম্যাজিক-দেখানেওয়ালা এক হেকিম।

গলিতে গলিতে মিছিল

মিছিল নয়—
পাকানো মুঠোগুলো খুলে
লাইন বেঁধে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে
রেশনের থলি।

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম

মাসভর একাদশী পড়ার রাগে
আমাদের কালো বেড়াল
গেল মাসের ক্যালেণ্ডারের পাতাটা
নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে—

কেবলি আঁচড়াচ্ছে॥

আমার ছায়াটা

আগুন মুখে ক'রে
একটা দড়ি
বেড়ার গায়ে ঝুলছিল

সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে
দেয়ালের গায়ে
চোখ পড়ল

ঠিক আমার পাশে দাঁড়িয়ে
আমাকে অবিকল নকল করছে
আমার ছায়া
মাথায় আমারই মতো পাখির বাসা
চোখে চশমা
ঠোঁটে সিগারেট ধরা

ধোঁয়ার জায়গাগুলো নিখুঁতভাবে ফোটালেও
আমি লক্ষ্য করলাম
আগুনের জায়গাটা
ইচ্ছে ক'রেই যেন চেপে গেল

দেয়ালের গা থেকে ছায়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে
ফুটপাথে আমি আছড়ে ফেললাম
তারপর টেনে
হেঁচড়াতে হেঁচডাতে নিয়ে গেলাম
একটা গাছের নীচে

ছায়াটাকে রেখে বেরিয়ে আসছি
আমাকে টপ্‌কে
পেছন থেকে সামনে লাফিয়ে পড়ল
আমার সেই ছায়া

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সরিয়ে নড়িয়ে
অনেক চেষ্টা ক'রেও
আমি তাকে ছাড়াতে পারলাম না

তখন আমি এই ব'লে তাকে শাসালাম

শয়তান
এবার আমি আগুনের মধ্যে যাব॥

হাত বাড়ালে

কোন্ দিকে? কোথায় তুমি যাবে?
মোড়ে মোড়ে
অন্ধকারে ধ'রে আছে ডাল
সারি সারি প্রশ্নচিহ্ন—
হেঁট মুণ্ডে
ঝুলছে পঞ্চবিংশতি বেতাল।

কাকে কী উত্তর দেবে, কাকে কী বোঝাবে?
চারিদিক ছিন্নভিন্ন;
সভার বিরুদ্ধে সভা ব'সে গেছে,
সমিতির বিরুদ্ধে সমিতি।
পিছনে তাকালে স্পষ্ট দেখতে পাই…—
এখনও বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে আছে
প্রিয়তম স্মৃতি;
এখনও মধুরতম গান বাজে
সমবেত কণ্ঠের আওয়াজে।

রক্তে পা ডুবিয়ে হাঁটছে
নিষ্ঠুর সময়,
সারা পৃথিবীকে টানছে

রসাতলে
　　এখনও আকাশচুম্বী ভয়।

অথচ সামনেই হাত আরেকটু বাড়ালে—
রয়েছে বন্ধুর হাত,
　　　সুখশান্তি,
　　　　বাঞ্ছিত জগৎ—

যদি একবার বোঝো তুমি

থুথু দিয়ে জোড়া যায় না,
জুড়তে হয় ভগ্নমনোরথ—
　　　　　এ আগুনে,
　　　　　　এই রাংঝালে॥

আশ্চর্য কলম

এই যে দাদা, এতদিনে বেরিয়েছে—
নতুন ফরমুলায় তৈরি
খলিফাচাঁদের আশ্চর্য কলম : 'খাই-খাই।'
চোর, জোচ্চোর, লোচ্চা, লম্পট, খাজা, খোজা,
পণ্ডিত, মূর্খ যে-কেউ চোখ বুঁজে
রাতারাতি লেখক হতে পারে।
এ কলম হাতে থাকলে
বসা বা দাঁড়ানো, চিৎ বা উপুড়
যে-কোনো অবস্থায়
প্রকাশ্যে ঝোপ বুঝে কোপ দেওয়া যায়—
কোনোরকম তাগবাগ বা রাখঢাকের দরকার হয় না।

দিনকে রাত, সোজাকে কাত,
হতাশকে হাত করতে
এ কলমের জুড়ি নেই।
মনে রাখবেন, নতুন ফরমুলায় তৈরি
খলিফাচাঁদের আশ্চর্য কলম
'খাই-খাই।'

রাঘববোয়াল থেকে চুনোপুঁটি
হরেক সাইজের পাওয়া যায়;
দাম উত্তমমধ্যম হিসেবে।
সঙ্গে বিনামূল্যে চুন এবং কালি।

এ লাইনে
যদি কোনো ভদ্রলোকের আবশ্যক হয়।
বলবেন।।

বন্ধু

চাঁদনিতে মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে টর্চ।
চোখে হাত চাপা দিয়ে
আলোগুলো
আঙুল দিয়ে অন্ধকারকে দেখাচ্ছে।

জলের পাম্পগুলো
থেকে থেকে হরবোলার মতো
কখনও ঝিঁঝির ডাক, কখনও সাইরেনের শব্দ
নকল ক'রে চলেছে।

পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে
ছায়ার মতো মানুষ;
চেনা মুখগুলোও
এই অন্ধকারে আমি চিনতে পারছি না।

আমার কাঁধে
এখন কেউ এসে যদি হাত রাখে
আমি চমকে উঠব।
এ অন্ধকারে
কেউ যদি আমাকে আলো দেখায়
আমি তার হাত মুচড়ে দেব।

কেননা
অপরিচয়ের এই অন্ধকার
এখন আমাদের বন্ধু॥

খড়ির দাগে

ওপরে আকাশ নীল ব্যথার মোচড়ে

দাঁড়িয়ে রাস্তার মোড়ে
একে ওকে তাকে হাত দেখাচ্ছে পুলিশ

ইস্
সে ফুঁকেছে শিঙে
চৌপহর দিন ঝুলত যার উলিডুলি ফতুয়াটা
পিছনের লোহার রেলিঙে
ছানিপড়া চোখে চশমা আঁটা
সেই তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা
হাত-দেখা
গনৎকার বুড়ো
ফুটপাথে খড়ির দাগ মোছে নি এখনও

সে জায়গায় ব'সে প'ড়ে
ঘ'ষে ঘ'ষে গুঁড়ো
নতুনের মতো করছে যা কিছু পুরোনো
কোথাকার কোন এক ফড়ে

ফুটপাথে খড়ির দাগ দেখাচ্ছে অদ্ভুত
জন্ম মৃত্যু প্রেম জরা যৌবন শৈশব
ভূতভবিষ্যৎ সব

ধ্যুৎ!
মনকে বোঝাই।
ছাই!
কষ্ট কিছু হচ্ছে বটে জুতোর পেরেকে
দেখে শুনে পা রেখে পা রেখে
এই আর একটু পথ যেতে পারলে ব্যস্
সমস্ত অভ্যাস

ঘুরে ঘুরে কী নতুন খেলনা উঠল দেখি

আরে আরে এ কী
মারলে দেখি
মধুর আওয়াজে

রুনুঝুনু বাজে

বাহবা বাহবা বাঃ ব্রেভো

এবারের জন্মদিনে ওপরঅলাকে এই খেলনাটাই দেব

শুনতে পাচ্ছি দূরে ভাগ্যচক্রের ঘর্ঘর
কাছে এলে ঝুলে পড়ব যত হোক ভিড়

রাস্তার ঝাঁঝরির মুখে বিড়বিড় বিড়বিড়
জানি না কে আউড়ে যাচ্ছে কিসের মন্তর॥

সাফাই

শেষ লড়াইয়ের গড়খাইগুলো
বড় বড় বাড়ির গাঁথনিতে
এখন অদৃশ্য।
নাকে দড়ি বেঁধে
আগে যেখানে ভালুক-নাচ হত—
সেখানে এখন ভুঁড়ি নাচিয়ে
লিফ্‌টে উঠছে নামছে
কালোকে সাদা করার হাত-সাফাই।

গিয়ে দাঁড়াতেই
ডান দিক থেকে একজনকে উনিশ বলতে শুনে
বাঁ দিক থেকে যেই একজন বলেছে বিশ
সামনে থেকে তক্ষুনি আর একজন একোইশ ব'লে
আমাকে ডেকে নিল॥

হালুম

রাত্তিরে শেষ শো-র পর
সচ্চরিত্র দর্শকেরা
যে যার বাড়িতে এখন
বন্ধ চোখের পর্দায় বিনা সেন্সারে
ছবি দেখছে।
একটু আগে অবিরাম কাশতে কাশতে
বজবজের তেল, বাটার জুতো
ঘাড়ে ক'রে নিয়ে
ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গেছে
মাঝরাতের মালগাড়ি।

হঠাৎ চিড়িয়াখানার বাঘগুলো
গাঁক গাঁক ক'রে ডেকে
শহরটাকে চল্‌কে দিল॥

আমার কাজ

আমি চাই কথাগুলোকে
পায়ের ওপর দাঁড় করাতে।
আমি চাই যেন চোখ ফোটে
প্রত্যেকটি ছায়ার।
স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে।

আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।

আমি যেন আমার কলমটা
ট্র্যাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি—
এই আমার ছুটি—
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও॥

এই জমি

কারো মুখের কথায় আর আমার বিশ্বাস নেই
আমি হাতেনাতে প্রমাণ চাইব।
আমাকেও কেউ মুখের কথায় বিশ্বাস করুক
আমি চাই না—
আগুনে
রক্তে
সংঘাতে
সবাই আমাকে বাজিয়ে নিক।

এই অন্ধকারে সেই বীভৎস মুখগুলো দেখতে পাচ্ছি—
একদিন কথা দিয়ে যারা আমাকে ভুলিয়েছিল।
জিঘাংসার যে নামই তারা দিক,
যুদ্ধকে যে পোশাকই তারা পরাক,
মৃত্যুর কোনো রমণীয় নামে
আর আমি ভুলছি না।

আসমুদ্রহিমাচল
আমার বিশ্বাসের জমি।
আমাকে কথায় ভুলিয়ে
সে জমি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না॥

ফড়েদের প্রতি

আমি জানি, আমি দাবা খেলতে বসলেই
পেছনে হুমড়ি খেয়ে পড়বে এক লক্ষ ফড়ে—
যে যার হাতের কাজ ফেলে রেখে
আমার প্রত্যেকটা চাল
পাখি পড়ানোর মতো ক'রে ব'লে দিতে চাইবে।

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না
এর পর
আমি কি তাদের করজোড়ে বলব—

হে ভদ্রমহোদয়গণ,

হয় চুপচাপ ব'সে থেকে দেখুন
নয় যে যার জায়গায় ফিরে যান

আমার খেলাটা, দোহাই
এখন থেকে আমাকেই খেলতে দিন॥

একটি পোলিশ কবিতার ভগ্নাংশ

মনে হবে তুমি
যেন জ্বলন্ত মশাল
ভগ্নকণায় বায়ুমণ্ডল ঠাসা।
তুমি তো জানো না ভবিতব্যে কী আছে—
মুক্তি? অথবা নিয়তি সর্বনাশা!
ঝঞ্ঝা কি শুধু টানবেই রসাতলে?
শুধুই ভস্ম! শুধু নিরাকার ধ্বনি!
নাকি দিন গোনে মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল—
ভস্মের নীচে সেই তো বজ্রমণি॥

সান্ধ্য

একটু আগে হাওয়ার একটা হল্লা এসে
মারমুখো মেঘগুলোকে
তাড়িয়ে নিয়ে গেছে।

গঙ্গার ধারে গাছগুলো
কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল
বৃষ্টির কয়েকটা ফোঁটা।

আর আমাদের প্রায় ঘাড়ের ওপর দিয়ে
লাইনে পা টেনে টেনে
বুড়োর মতো কাশতে কাশতে চলে গেল
একটা মালগাড়ি।

আমরা ছেলেবেলার দুই বন্ধু
সাঁকোর ওপর থেকে ঝুঁকে প'ড়ে দেখছিলাম

দড়ির আগায় কী যেন বেঁধে
যারা কাঁকড়া ধরতে বসেছিল
আলো পড়ে এলে
খালি হাতে তারা উঠে চলে গেল।

জেটির গায়ে কিলবিল করছে
নোঙর-বাঁধা নৌকো।
ছইয়ের ভেতর লণ্ঠনগুলো জ্বলল।
একটা জ্বলন্ত কাগজ
হাত ছেড়ে দিয়ে
স্রোতের ওপর
বেশ খানিকক্ষণ মজা ক'রে ভাসল।
আমাদের নাকের ডগায় একটা জাহাজ
জলের ওপর থেব্‌ড়ে ব'সে
মেয়েদের মতো হাঁটুদুটো দু-পাশে এলিয়ে দিয়ে
কাঁটা হাতে
যেন বুনতে বসেছে।

তার
কোলের ওপর খেলা করছে
স্তব্ধতা।

একটা শান-বাঁধানো বেঞ্চিতে
আমরা অনেকক্ষণ
ব'সে থাকলাম।

জীবনটাকে চিনেবাদামের খোলায়
ছাড়াতে ছাড়াতে
যখন প্রায় ফুরিয়ে ফেলেছি—
পেছনে পায়ের শব্দে
তাকালাম।

একটি ছেলে
আর একটি মেয়ে
বসবে ব'লে
উসখুস করছে।

ফেরবার তাড়া ছিল ব'লে
আমরা দু-জনেই
একই সঙ্গে উঠে পড়লাম।

তখনই চোখে পড়ল

নদীর ওপারে
রাস্তার আলোগুলো
অন্ধকারের গলায় সদ্য মালা পরিয়ে দিয়েছে॥

খেলা দেখে যান

মাথার ওপর
খাটানো নীল
বিনিপয়সার তাঁবু।

নীচে সবুজ
গাল্‌চে পাতা।
খেলা দেখে যান, বাবু!

ঢোলক বাজে
ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌
ভরসন্ধেবেলা।
হাজার ঢেউয়ের
হাততালিতে
জ'মে উঠেছে খেলা।

বাঃ বাহবা!
বাহবা বাঃ!
সাবাস বলিহারি—
হাঁড়ির মধ্যে
মাটি আছে, না
মাটির মধ্যে হাঁড়ি!

এই ছিল না—
এই তো আছে!
এই আছে, এই ফক্কা।
বুকের মধ্যে
রঙের তাস
হরতনের টেক্কা।

জোনাক জ্বালে
ঝাড়লণ্ঠন।
কেই বা জানে কী ঠিক!

গোঁফটা ঢেকে
পুপের বেড়াল
চাইছে হাফটিকিট।

মাথার ওপর
টাঙানো নীল
বিনিপয়সার তাঁবু
খেলা দেখে যান!
খেলা দেখে যান!
খেলা দেখে যান, বাবু॥

যা হট্

নায়েব, গোমস্তা, বাঈজি, মাহুত, সহিস
তোশাখানা, রাতকে-দিন-করবার ডায়নামো
সব চাই, নইলে গ্রামে থাকাই বোকামো—
বোতলকে-বোতল ক'রে দৈনিক হাবিস
আত্মারাম খাঁচা ছেড়ে দিতেই চম্পট
সে-গদিতে বসতে গেল যে তার ওয়ারিশ

কালের সেপাই এসে ঘাড় ধ'রে তুলে দিয়ে বলল: যা—হট্!

উঠে আসছে শক, হূণ, কুষাণ, পহ্লবী

স্বপ্নাদ্য কলমে, হচ্ছে ছাপাই বাঁধাই;
বই যা ভারী, বইতে পারে একমাত্র গাধাই—
কী মজা, লিখলেই সব হয়ে যাচ্ছে ছবি!
মগজে ডবল শিফ্‌টে তৈরি ক'রে প্লট
যেই না নেবার চেষ্টা লেখক পদবি

কালের সেপাই এসে ঘাড় ধ'রে তুলে দিয়ে বলল: যা—হট্‌!

আমাদের মুক্তকচ্ছ রণছোড় বাবাজি
ভোটযুদ্ধং দেহি ব'লে আঁটেন মালকোঁচা
যাকেই তাকিয়ে মনে হয় খাঁদাবোঁচা
তাকেই আটকান জেলে। কারণ, সে গররাজি
মন্ত্র পড়তে গণতন্ত্রে ওঁ স্বাহা ফট্‌—
পাঁচসালা উৎরে দেবে সত্যি কি ভোজবাজি?

কালের সেপাই ব'সে খেলা দেখে।
এবার বড়ের চালে কিস্তি পড়বে?
নাকি হবে মন্ত্রীর পালট॥

হেঁ-হেঁ আলির ছড়া

কাণ্ড

মহকুমার সদরে ভাই
দেখে এলাম কাণ্ড
একজন ডালে একজন পাতায়
খোঁজে গাছের কাণ্ড
দেখতে তালপাতার সেপাই
মাথাগুলো প্রকাণ্ড

তাকায় না ফলফুলে
লক্ষ্য একদম মূলে
বলে না অবিশ্যি খুলে
তারা ছাড়া বাকি সবাই
কেন অকালকুষ্মাণ্ড

এ কয় ওরে, শিখো রে
পৌঁছুতে হয় কী ক'রে
সোজা সটান শিকড়ে—

ব'লে যেই না হাত ছেড়ে দেয়
চিৎ ক'রে দেয় ব্রহ্মাণ্ড॥

বাঘে

চরাতে নিয়ে গিয়েছিলম গো মালিক
তিন শো শব্দ গো
মালিক
তিন শো শব্দ
ফিরে এলম গো মালিক
তিনটে কম গো
মালিক
তিনটে কম

একটি ছিল আগে
সেটিকে পেয়ে বাগে
খেয়ে নিলে হালম গো মালিক
খেয়ে নিলে হালম।

দুটিকে দিলে খোঁয়াড়ে
ও-পাড়ার সেই চোয়াড়ে।
একটি ভূত
একটি ভগমানের পুত—
ভালোবাসা ছিল সবার আগে গো মালিক
ছিল গো মালিক আগে—
তাকেই খেলে বাঘে॥

তিন্তিড়ি

তেঁতুলতলায় শব্দ কিসের
বিশ্রী বিদিকিচ্ছিরি—
কে ওখানে? কে হে?

এজ্ঞে, আমি হেঁ-হেঁ—
অন্ধকারে চোখটা জ্বেলে
খুঁজে বেড়াচ্ছি তিন্তিড়ি।

ঢুকব কি না ঢুকব দেহে—
মুখপুড়িটা আমায় ফেলে
দিয়েছে দেখুন, কী বিষম সন্দেহে॥

কাছে দূরে

মুখখানি যেন ভোরের শেফালি
নেমে গেল এক্ষুনি
দু-অধরে চেপে চাঁদ একফালি
নেমে গেল এক্ষুনি

তার দুটি আঁখি খঞ্জন পাখি
দূরে কাছে ঘুরে নাচে
এই আছে এই নেই আছে নেই
দূরে কাছে ঘুরে নাচে

নেমে গেল এক্ষুনি

হাওয়া বারে বারে আঁচল সরায়
হাত বারে বারে ঢাকে
হাত খালি হলে আঙুল জড়ায়
সময়কে পাকে পাকে

নেমে গেল এক্ষুনি

ঝুঁকে প'ড়ে চোখে চূর্ণ অলক
যেন চায় পড়ে নিতে
শ্বেতপাথরের স্মৃতির ফলক
মণি-জ্বলা চারিভিতে

নেমে গেল এক্ষুনি

পদচারণায় দূরে নিয়ে যায়
তার কায়া তার ছায়া
দু-চরণে বোনা যাব কি যাব না
ও-বনে ও-যৌবনে

নেমে গেল এক্ষুনি

থাকতে দেখি নি চেয়ে অকপটে
তার সে মুখচ্ছবি
দেখি আকাশের প্রচ্ছদপটে
ছাপা সে মুখচ্ছবি

নেমে গেল এক্ষুনি
ট্রেন খালি ক'রে ভোরের শেফালি
নেমে গেল এক্ষুনি॥

রোদে দেব

আমরা বড়োরা কেন বার বার
পালিয়ে এ-ঘরে এসে
চোখ মুছি?
মেয়েটা অবাক হয়,
ভাবে—

আমরা নিশ্চয় কাঁদছি!
তা যদি না হবে—
আমাদের চোখে কেন জল?

বোকা মেয়ে!
কী ক'রে বোঝাই—

কখনও কখনও
চোখের কুয়োয় জল তোলে
কান্না নয়

—জ্বালা!

বোকা মেয়ে!
ভিজে কাঠে যখনই ফুঁ দিই—

কিছুতে ধরে না আঁচ,
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
চোখে ধরে জ্বালা;
যেদিকে তাকাই দেখি
সমস্ত ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার।

চোখের জ্বালায়
আমরা বাইরে আসি
চোখ মুছি

চোখে আমাদের তাই জল।

জীবনের এই হাল
তা ব'লে বছরভর নয়—
কেবল বর্ষার ক-টা মাস।

শুকনো কাঠে
গন্‌গনে আগুনে হবে
দেখতে দেখতে ভাত—
তখন আবার সব যেখানে যা আছে
ঠিকঠাক
স্পষ্ট দেখতে পাব

বর্ষা গেলে
কাঠকুটো, ভিজে সব কিছু
রোদে দেব

রোদে দেব
এমন-কি হৃদয়ও॥

কাল মধুমাস

বার বার ফিরে আসা নয়।
পারাপার
নয়।

শুধু যাওয়া।

এখন কথাটা হল,
কখন কী ভাবে
যাবে—
আকাশের কেমন আবহাওয়া।

মনে রেখো,
এ নদীতে একবার
শুধুই একবার
একটি মাত্র খেপ।

তা নিয়ে আক্ষেপ
করবার
পাত্রই আমি নই।

একবার
একবারই সই।
কথাটা, কী ভাবে
যাবে—

ক্ষণে ক্ষণে
মরতে মরতে?
না কি বেঁচে
নেচে নেচে
ঢেউয়ের মাথায়?

হালে পানি, পালে হাওয়া
না লাগে লাগুক—

কী আনন্দ, কী সুখ

যায় দিন, যায়॥

২

যদিও আবাল্য চোখে দেখে আসছি কম
ইদানীং ডান কানে
ইস্,
একদম শুনছি না—
দ্রোণাচার্য তুচ্ছজ্ঞানে
নেন নি ভাগ্যিস
বাল্যে বুড়ো-আঙুল দক্ষিণা।

পারলে তাই দেখাতে ভুলি না
যখন যেখানে যাকে
দেখানো দরকার।

যৌবন বিদায় নিয়ে
এতক্ষণে পৌঁছে গেছে যেখানে যাবার।
মিষ্টি হেসে
হাত নেড়ে তাকে বলেছিলাম, বিদায়!
মেয়েলি ঈর্ষায়
প্রৌঢ়ত্বও করছে যাব-যাব।
এবার তাই ঠিক করেছি, যাবার সময়
দু হাতে লাল-নীল দুটো রুমাল ওড়াব।
তারপর টুকটুক ক'রে বাড়ি ফিরব শনৈঃ শনৈঃ

সময় তো জানোই—
নয় ব্যাকরণের অব্যয়।
যখন যে পদে থাকে
সেইমতো আকার।
সময়ের সঙ্গে আমরা সম্বন্ধ পাতাই
ছোট, বড়, গোল, চৌকো নানান মাপের।
সময়টা এক নয়—
এর ওর তার।

তোমার সময় দিয়ে তাই
বৃথা চেষ্টা আমাকে মাপবার।

তুমি ব'সে কাজ করো।

আমি উঠি।
যাই
গিয়ে দেখে আসি
কোথায় আকাশটা খুব বড়ো।
দেখে আসি পড়ো-পড়ো
কোথায় কখন কোন্ খুঁটি।
যাই
গিয়ে দেখে আসি
কী বীজ বুনছে মাঠে চাষী।

তুমি কাজ করো।

আমি কিন্তু
যখনকার কাজ ঠিক তখন না ক'রে—
দাঁড়াব রাস্তার মোড়ে;
যেখানে বিস্তর লোক একেবারে পৃথক কারণে
এক স্থানে এক কালে জড়ো।
সেখানে আমিই একা অহেতুক;
ভেবে দেখব মনে মনে
জীবনের এ আবার কোন এক রহস্যকৌতুক!

খুব জোর বৃষ্টি আসছে;
আকাশ মিশকালো।
আলো জ্বালো;
জানলা-দরজা দাও বন্ধ ক'রে।
বন্ধ শার্সিটার গায়ে
বুনে নাও এই বেলা
খালি হাতে
যত ইচ্ছে আকাশকুসুম।

আমি যাই।
আজ বছরের এই প্রথম মরশুম

গায়ে এসে বিঁধবে যেন বর্শার ফলক
আকাশটা দুখানা করবে
বিদ্যুৎ ঝলক।
নেব না বর্ষাতি কিংবা ছাতা।

আমার স্বভাব নয়, তাই
বাঁচাই না মাথা
—রোদে না, জলে না।

যাই
কিছুক্ষণ গিয়ে বসি
যে-পুকুরে মাছগুলো
জলের গভীরে দিচ্ছে ঘাই।
যাংনায় বেঁধানো থাকবে চোখ
পাশে ব'সে থাকবে হয়তো বুড়োমতো লোক—
পরক্ষণে মনে হবে, আরে রাম রাম
লোকটা তো আমারই বয়সী।

ঘেঁষটে ঘেঁষটে যাচ্ছে ট্রাম।
আমাদের গলি দিয়ে যাওয়া এক
বিকলাঙ্গ ভিখিরির মতো
দুর্বিষহ মর্মন্তুদ কর্কশ আওয়াজ।

বিকেলে মিছিল থাকলে আজ
ছোকরাদের সঙ্গে যাব পাল্লা দিয়ে হেঁটে
সারিবদ্ধ দুটো হাত দোলাতে দোলাতে।
পরদিন প'ড়ে নেব, এই যুক্তি এঁটে—
সভায় যা বলা হবে না-শুনে সাক্ষাতে
দল বেঁধে দোকানে চা খাব।

আর যদি সেইসঙ্গে ভাগ্যে যায় জুটে
তবে বাড়ি-গাড়িও হাঁকাব।

ততদিন ঘুরে ঘুরে এ-ফুটে ও-ফুটে
এর ওর তার সঙ্গে
জমাব আলাপ।

হেসে বলব : কী খবর? কেমন আছেন?
হাতে খুঁজব হাতের উত্তাপ।

কে হে লোকটা? এক হাতে বোঁটাসুদ্ধ চুন,
অন্য হাতে কোঁচা?
যেতে যেতে দিয়ে গেল খোঁচা?
'কী মশাই, লিখছেন না কেন?
লিখুন! লিখুন!'

লোকটার বরাত ভালো :
চলে গেল।
নইলে ও নির্ঘাৎ হত খুন॥

৩

চলেছে রাত্রের ট্রেন,
বাইরে নিকষ অন্ধকার।

জানলা টপকে ছুটে যাচ্ছে উল্টোমুখে
আলোয় কিম্ভূতকিমাকার
মূর্তি সব।
সারা কামরা নিস্তব্ধ নিঝুম।

জেগে একা বসে আছে শিশু—
চোখে নেই ঘুম।
সমানে চলেছে বাইরে
পৈশাচিক কী এক উৎসব।
ডাকলে কেউ উঠবে না সে জানে—
দাদা দিদি কাকা বাবা সব পিপুফিশু।

সে জানে না কোথায় চলেছে
মনে সে যা নিয়েছিল এঁচে
মিলছে না কিছুই।

এই অন্ধকার তার ছিল না হিসেবে
স্বপ্নে তার ছিল না স্তব্ধতা।

এই ভয়ংকর ভয়
ডেকে তুলে কাকেই বা দেবে।

শেষ রাত আন্দাজ
হঠাৎ সবাইকে ডেকে তুলে দিল
শূন্যতা ভরাট করা
গুম গুম আওয়াজ।
মা বললেন : দ্যাখ্ দ্যাখ্, পদ্মা ঐ দূরে—
সাড়া ব্রিজ এই।
আমরা জয় মা কালী ব'লে
দিলাম সজোরে পয়সা ছুঁড়ে
যে তিমির
সেই তিমিরেই।

তারপর সেই শিশু আবার ঘুমুলো।
স্বপ্নে দেখল: ছাদের যেখানে চাঁদ থাকে
তার পাশে ফণিমনসার টবটাতে
বসে আছে ফের সেই হুলো।

মাকে যেই সে ডাকতে যাবে
মা তার আগেই
ডেকে তাকে ট্রাঙ্কটা খুললেন—

ট্রাঙ্ক থেকে কী বেরুলো বলো।

দুটো তুবড়ি আর দুটো লাল-নীল দেশলাই।
তখন অনেক রাত,
পাড়াসুদ্ধু বাড়িসুদ্ধু ঘুমোচ্ছে সবাই।

তারপর কী যে মজা হল॥

৪

সেও এক ব্রিজ-ই
ওপরে টমটম যায় গুড়-গুড় গুড়-গুড়,
নীচে চাও যদি—
হিজিবিজি হিজিবিজি

নদী নৌকো নদী নৌকো নদী।

নাম নওগাঁ;
অজ মফস্বলে এক নগণ্য শহর।
বৃষ্টিপাত বেশ ক-ইঞ্চি বেশি,
নেহাত নগণ্য নয়
সেখানকার শীতের বহর।

দু-পাশের রেন্‌ট্রি গাছে ছায়ায় ছায়ায়
দিগন্তের কোন্ অন্তরালে
জানতাম না কোথায় রাস্তা যায়—

কোন্ সে দুবলহাটি, দিঘাপতিয়াই বা কোথায়?
রান্নাঘরে জানলা দিয়ে দেখা যেত দূরের রাস্তায়
গলায় দুলিয়ে ঘণ্টা হাতি,
দুল্‌কি চালে কখনও বা উট।
দৈনিক সকালে ঠিক কাঁটায় কাঁটায়
রানারের ছুট।

বাইরে বোতামফুল বেল জুঁই, ব্যস্—
ভেতরের ছোট্ট উঠোনে
তুলসীমঞ্চ কাঠগোলাপ হাস্নাহানা দোপাটি টগর
করবী মোরগঝুঁটি ফুল; তিনটে হাঁস;
পেঁয়াজ, উচ্ছের মাচা; লক্ষ্মীগাই থাকত এক কোণে—
দুধ দিলে ডিম পাড়লে যা হত রগড়।
শীতকালে সার্কাস আসত;
ইস্কুলের মাঠে পড়ত তাঁবু।
কী মুশকিলে পড়তেন যে হারাধনবাবু—
কাছে হবে মনে ক'রে
ছোট্ট তিনফুট উঁচু ঢিবিটায় উঠে তিনি রোজ
আকাশের তারা দেখে দেখে
খাতা ভ'রে কী সব টুকতেন।
সেই ঢিবি একদিন সার্কাসের তাঁবু দিত ঢেকে।

কুড়কুড় কুড়কুড় ক'রে বাজনার বোলে

ঘোড়ার গাড়িটা যেত লাল নীল সবুজ হলুদ
কত কী সুখের পায়রা ওড়াতে ওড়াতে।
আমরা এইটুকুটুকু আধভাঙা খুদ
স্বেচ্ছায় দিতাম ধরা তাদের কবলে।
সারাদিন আমাদের মহানন্দে খুঁটে খুঁটে খেত—

শেষের সপ্তাহে রোজ অদ্য-শেষ-রজনী বুঝিয়ে
সারাটা শহর কানা ক'রে দিয়ে
জানি না কোথায় উড়ে যেত।

পাশের বাড়িতে থাকত আমার যে-বন্ধু, তার এক ছিলেন পিসিমা—
তিনি এলে ঘরে বসত মা-মাসিমাদের আসর
ঝুলিতে গল্পের তাঁর ছিল নাকো সীমা পরিসীমা
জিভে তাঁর কিছুই বাধত না।
কোন্ এক জেলার কোন্ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব
কবে কোন্ ট্রেনের কামরায়—
রসসিক্ত হয়ে উঠত বক্তার রসনা
—মেমকে আদর ক'রে বসালেন কোলে।
ছোটদের শুনতে নেই—কী হল তারপর
শুনেছি। কারণ, তাতে বিস্কুট ছিল ব'লে।
কামরায় আর যারা ছিল কচর মচর
খেতে লাগল সাহেবের টিন থেকে দামি দামি বিলিতি বিস্কুট
ছোটদের দুর্বোধ্য ছিল
মধ্যে মধ্যে থাকত যা ব্যাসকূট।

বলতে বলতে হঠাৎ তিনি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে
চিৎপাত হতেন তক্তপোশের ওপর
মা কালী করতেন তাঁকে ভর।
না থেমে গড়গড় ক'রে যা বলতেন তিনি
শুনে সারা গায়ে দিত কাঁটা—

নরকের যত সব ডাকিনী প্রেতিনী
তাঁকে দিচ্ছে সাজা,
বেঁধাচ্ছে গরম লোহা, উপ্‌ড়ে নিচ্ছে চোখ
তেলের কড়াইতে করছে ভাজা—

তাঁর বর্ণনার কাছে
এখনকার পাপবিদ্ধ কবিতা কিছু না।
মনে মনে ওঁর জন্যে ঠাকুরকে ডাকতাম:
হে ঠাকুর, কেন ওঁকে শান্তি দাও না? কেন ওঁকে করো না করুণা!

সকালে শীতের ভোরে তারের বেড়ায়
ঝুলে ঝুলে থাকত যেন নাকের নোলক।
বিকেল বেলায়
সূর্য ডুবে গেলে করত কী মন কেমন।

ছিল একটা খেলনার ঢোলক
ছেলেমেয়ে একসঙ্গে খেলতাম চত্বরে।
কখনও কখনও খুব নরম হাত ধ'রে
কোনো কিছু না ভেবেই হয়তো বলতাম :
তোর এই আয়মন নাম,
নামের মানেটা কী রে? আয় মন, আয় মন, নাকি?
বাঃ, কী সুন্দর গন্ধ,
হাতে বুঝি মেহেদির রং?

চড়কের আগে আসত সং—
কাছের গ্রামের এক বহুরূপী; বছরে একবার।
মেসবাড়িতে তার চেয়েও আসত লোক হরেক রকম।
এক আসত শীল্ডে খেলতে নানা জায়গাকার
নামী নামী অনেক প্লেয়ার।
তাদের পা টিপতে গিয়ে আমাদের নিক্‌লে যেত দম।

এক এসেছিল শিল্প-প্রদর্শনী নিয়ে
সরকারের লোক এক; তারই টেবিলে
কাঁচের কাগজচাপা দেখে
জীবনে প্রথম সেই কী-যে হয়েছিলাম স্তম্ভিত!
এজন্যে নয় যে, সেটা কাঁচ।
আসলে কাগজচাপা ব'সে ছিল দিব্যি সেই কাঁচের মধ্যে গিলে
শ্যামপত্রশোভাসমন্বিত
সম্পূর্ণ একটি গাছ।

আর এসেছিল

বন্যার্ত অঞ্চল থেকে হাতি চ'ড়ে
এক জমিদার, তার দলবলসহ।
সন্ধেবেলা তার ঘরে
বইত রোজ ফুর্তির ফোয়ারা।
দরজায় পর্দা থাকত,
বাইরে দিত সবন্দুক সেপাই পাহারা।
কালোয়াতি গানের গমক,
ঘুঙুরের বোল আর অদৃশ্য ঠমক
উপ্‌চে পড়ত মাঝে মাঝে বাইরের মাঠে।

বন্যা নেমে যাওয়ার ঠিক মুখে—
গিন্নি-মা উঠলেন খাটে
সিঁদুর-চন্দনে রাজরাজেশ্বরী সেজে
কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল আহাম্মক ঝিটাই—

মা, তোমার গৌরবর্ণ নীল হল কিসে!

'কিসে' শুনতে লোকে নাকি শুনেছিল 'বিষে'—
সেই দোষে ঝি হল ছাঁটাই।
ব্যাপারটা সকলেরই নাকি জানা
কিছুই জানি নি আমরা কী বৃত্তান্ত—
ছোটদের জানবারও কথা না।

খেতালচাষীরা আসত পাট্টা নিতে;
তখন সামনের মাঠে পা ফেলা যেত না।
ঘটি নিয়ে ঘুরে ঘুরে জল দিতাম আমি আর দাদা।
শুধু শুকনো ঐটুকু পানিতে
কী ক'রে যে মিলে যায় খোদাতালার এত দোয়া।
—সেটা ছিল ধাঁধা।
কিছুতে নিতাম না হাতে গুঁজে দিলে কেউ লজেঞ্চুস।

আবগারি-দারোগা হয়ে বাবার যে নামডাক এত—
দাদা বলত, কী জন্যে বল্‌ তো?
কারণ, নেন না বাবা ঘুষ।
জল দিয়ে লজেঞ্চুস
এক রকম ঘুষ।

কাঁথিতে কোথাও কোনো সমুদ্রের ধারে
নুন তৈরি করতে গিয়ে পুলিশের বুটের কাঁটায়
ঝাঁঝরা হয়েছিল যার পিঠ—
সে এল স্ট্রেচারে।

সমস্ত শহর ক্ষুব্ধ; ফেটে পড়ছি রাগে
আমরা সবাই।
মাঝে মাঝে হাঁক উঠছে: জোর্‌সে বলো. ভাই—
বন্দে মাতরম্‌।
সারাটা শহর করছে থমথম।
গুপ্তকক্ষে ব'সে ব'সে নিজের অস্থিতে
বজ্র যেন বানাচ্ছে দধীচি।

এমন সময়
হে ধরণী দ্বিধা হও, আমি যাই পাতালে তলিয়ে—
ভিড়ের ভেতর থেকে ও কে বলল : ছি, ছি,
তোর বাপ সরকারি চাকুরে!

সন্ধেবেলা একদিন বাপু রে,
মহকুমা হাকিমের কুঠিতে কী ভিড়—
রেডিও শোনাবে এস্‌-ডি-ওর জামাই।
সকলেই আমন্ত্রিত:
এসেছে সবাই।
মাস্টার, মুনসেফ, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, উকিল, মোক্তার
সিভিল সার্জেন, সোডাকলের মালিক,
থানার দারোগা, সাব-রেজিস্ট্রার, পশুর ডাক্তার—
সবাই এলেন।
একে এস্‌-ডি-ওর জামাই
তদুপরি শোনাবে রেডিও।
সুতরাং সবাই হাজির
শহরের মশামাছিটিও।

এদিকে সময় যায় বয়ে।
তার-আলো আলো-তার, এ-কল, সে-কল

এ ছুঁই, তা ছুঁই—
গলদ্‌ঘর্ম এস্‌-ডি-ওর জামাই বেচারিঃ
হয় নাকো কিছুতে কিছুই।
শেষকালে শব্দ এল অবিকল
—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেবারে অবিকল—
কী কাণ্ড, সমানে ডাকছে একগাদা কুকুর-বেড়াল।
এস্‌-ডি-ওর থোঁতা মুখ ভোঁতা হতে দেখে
একদল কী খুশী!
এস্‌-ডি-ওর বরাবরে উকিলরা দিল
সরকারকে দুয়ো।
আরেকজন বলল, ঐ জামাতাটি ভুষি।
শেষের দলটি বলল, এ থেকেই বোঝা যায়
রেড্ডিও ব্যাপারটাই ভুয়ো।

বাঁ-দিকে মার্জিন-টানা বালির কাগজ,
গঁদের আঠার শিশি, চাবি আর তালা
লাল-হলদে সুতোর বাণ্ডিল,
শিলমোহর, গালা
—এই নিয়ে ছিল
বাবার টেবিল।

আর ছিল পেন্সিল কাটার একটা ছুরি

একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে দেখি
হৈ হৈ ব্যাপার।
পেন্সিল কাটার সেই ছুরি হাতে, এ কী—

উঠোনে দাঁড়িয়ে মেজো খুড়ি।
বাবার মতলব ছিল নাকি
নিজের গলায় বসাবার।
খাটো ক'রে গলা
'ওতে কি পেন্সিল ছাড়া' যেই বলা
আর যায় কোথা!
প্রচণ্ড ধমক অমনি : বড্ড হচ্ছ পাকা।

দিদির শাশুড়ি নাকি লিখেছেন যা তা

দেনাপাওনা এখনও ঢের বাকি।
অথচ দেনার দায়ে
বাবার বিকিয়ে আছে মাথা।

এদিকে চালের মন উঠেছে আট টাকা।

লোকে বলছে
লাগল ব'লে আবার লড়াই॥

৫

লিখি নি, ভাগ্যিস!

মা বলতেন: শুনে নে, লিখিস্—

পালকি এসে পৌঁছুল দেউড়িতে
সে পেয়েছে শিবতুল্য বর
বুকের ভেতরে ক'রে আনা
আশা তার মেলে দেবে ডানা—

আলো এল, ঘোমটাও সরালো
কে যেন ককিয়ে উঠল : কালো!
দাঁতে দাঁতে কড়মড় কড়মড়।
সেই থেকে সে রাক্ষসপুরীতে।

ভাগ্যিস, লিখি নি।

নইলে শিব গড়তে গিয়ে
হয়ে যেত নিশ্চয় বাঁদর।

মাকে মনে পড়ে।
মা আমাকে বলতেন বাঁদর।

কিন্তু তবু যখনই বৃষ্টিতে ঝড়ে
চমকাত বিদ্যুৎ
পাশে এসে মা বলতেন হেঁকে:
জয়মণি! স্থির হও।

যে-মন্ত্রে ঘেঁষে না কাছে ভূত
সে-মন্ত্র তো মার কাছেই শেখা।

আজ তাই শ্মশানে মশানে
কৃষ্ণপক্ষে ভয়ংকর যে-কোনো জায়গায়
যেতে পারি একা।

জলে কিংবা ঝড়ে
এখনও মেঘের দিকে যখনই তাকাই
মনে পড়ে মাকে।

কেন মনে পড়ে?
মা ছিলেন মেঘবর্ণ।
শুধুই কি তাই?

৬

দুয়ে আর দুয়ে আপনি ঠিক বলছেন চার?

দেখুন, আমার একটা কুষ্ঠির দরকার।
ভবিষ্যৎটা একটু ভালো ক'রে
জেনে নিতে চাই।
যা যা জানি ব'লে যাচ্ছি
আপনি তো গণক—
ফাঁকগুলো নিজগুণে ভ'রে
বানিয়ে দিন না একটা ছক!

প্রথম যুদ্ধের ঠিক পরে।
কত সাল
সেইটাই তো জানি না।

বার বুধ।

ভুলি নি, কারণ—
মা বলতেন : বুধবারে নখ কাটা
আমার বারণ!

রাশিটা বিচারাধীন।
আপনি রায় দিলে
তবেই চূড়ান্ত ব'লে গণ্য হবে রাশি।
দিদি বলেছিলেন একবার—
যতদূর মনে পড়ছে মীন।
হতেও বা পারে
যে রকম মাছ ভালোবাসি!

মাঘের সংক্রান্তি তিথি।
অকাট্য নির্ভুল।

আরেকটু বলি।
তারপর ইতি।
কী ক'রে জানি না—
আমার মনের মধ্যে জন্মগত ছবি একটা আছে,
একেবারে শীতের শেষদিন।
পাতা নেই গাছে।
দুটি ঠোঁট শব্দ তুলে অন্য দুটি ঠোঁটে
ব'লে ওঠে :
'মনে নেই? কাল মধুমাস!'

বলেছিল আর কেউ, আমার মা নন।

বললাম তো কারণ—
মা তখন আমাকে নিয়ে যন্ত্রণায় নীল॥

এই ভাই

বন্ধু কালীসাধন দাশগুপ্ত-কে

পূর্বপক্ষ

ছেলেপুলেগুলোকে থামাও তো!
ওঃ, সারাটা দিন যা গেছে!
এখন একটু গড়িয়ে নিই।

কী গেল? পাথরের সেই পুরোনো মূর্তিটা?
ইস, ভেঙে-ভেঙে ওরা আর কিছু রাখল না।
এখনকার যে কী হাওয়া!

একটু গড়িয়ে নিই।
ওঃ, সারাটা দিন যা গেছে!

মাঠে ধান রুয়েছি, পুকুরে চারামাছ।
জল হাওয়ায়, একটু রও, হানফান করে বাড়বে—
তারপর বায়না করে আনব
গাওনা-বাজনার দল।

ওঃ, সারাটা দিন যা গেছে!

হাতে ওদের খেলনা দাও।
কানে তালা ধরে গেল ওদের চিৎকারে।

বাবাজীবনেরা, ঘরে শান্ত হয়ে ব'সো—
সাপ আছে, শাঁকচুন্নি আছে
অন্ধকারে যেতে নেই।

চোখের পাতা দুটো বন্ধ ক'রে
ভালো করে দেখতে হবে
হা-ঘরে হা-ভাতেদের জন্যে কী করা যায়।

সারাদিন যা গেছে,
একটু গড়িয়ে নিই॥

উত্তরপক্ষ

১

বাবা বলেন, যখন হবার
আপনিই হয়,
আসল ব্যাপার
সময়।

বাবা বলেন, সবার আগে
জানা দরকার
স্রোতে লাগে
কখন জোয়ার,
কখনই বা ভাঁটা।

বাবা বলেন, এমনি ক'রে
সারা রাস্তা ধৈর্য ধ'রে
মড়া টপ্‌কে
মড়া টপ্‌কে
মড়া টপ্‌কে হাঁটা।

বাবারা যা বলেন তা কি ঠিক?
এও ভারি আশ্চর্য
গা বাঁচাবার নাম দিয়েছেন সহ্য।
বাবাদের ধিক্
বাবাদের ধিক্
বাবাদের ধিক্।

২

আমাদের প্রাণভোমরাগুলো বড় বড় খোলের মধ্যে ভ'রে
সরু সুতোয় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে;
আমরা অপেক্ষা করে আছি
মাথার ওপর বহ্নিমান হয়ে আকাশ কখন ভেঙে পড়বে।
এখন যে যতই সাফাই গাক্
হাত-ধোয়া নোংরা জল আমাদের চোখের ওপর দিয়ে
গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে।

বইতে পা লেগে গেলে আগে আমরা কপালে হাত ছোঁয়াতাম,
গায়ে পা ঠেকলেও এখন আমরা প্রণাম করি না;
এমন কাউকেই আমরা দেখছি না
যার সামনে হাতজোড় ক'রে দাঁড়াতে পারি।
সরু করে বানাচ্ছি প্যান্ট
যাতে হাঁটু গেড়ে বসতে না হয়,
যাতে সারা দুনিয়াকে আমরা ভালো করে পা দেখাতে পারি।
আর শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেব বলেই
আমাদের জামায় ফুল-লতা-পাতা কাটার ফৌজি ব্যবস্থা।
কেউ আমাদের আদর করে ভোলাতে এলে
আমরা কাঠপুতুলের মতো ঠিক্‌রে উঠি।
কানাকে কানা বলতে, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে
আমাদের মুখে একটুও আটকায় না।
ভদ্রতার মুখোশগুলো আমরা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছি,
কাউকেই আমরা নকল করতে চাই না।
যা বলবার আমরা জোর গলায় বলি,
শব্দ আমাদের ব্রহ্ম।

বাঁধা রাস্তায় পেটোর পর পেটো চম্‌কাতে-চম্‌কাতে
আমরা হাঁক দিই।
আমাদের আওয়াজে বাসুকি নড়ে উঠুক॥

সামনের স্টপে

সামনের স্টপেই আমি নেমে যাব।
হয়তো তারপর
এ-বাস আলো করে কেউ উঠবে।
হয়তো
খুব মজার কিছু ঘটবে।

যেমন ক'রে আমি উঠেছি
ঠিক তেমনি ক'রে
দুই কনুই দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে
আমি নেমে যাব।

গেটের কাছে একটু দাঁড়িয়ে

আমি যদি বলতে চাই:

'মশাইরা, আমাকে মাপ করবেন,
ভিড়ের মধ্যে আমি যাঁদের পা মাড়িয়েছি—'

লোকে নির্ঘাৎ
ঘাড় ধরে আমাকে নামিয়ে দেবে।

তখন হাতের টিকিটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে,
আমি বলতে চাই না,
তবু আমাকে বলতেই হবে, 'বাঁচলাম'॥

পাখির চোখ

আমি মুখ ভার করে ছিলাম—
এখন
ঘাড় টান ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছি।

আমার হাত উঠছিল না,—
এখন
আমি টান টান করে বাঁধছি
গাণ্ডীবের ছিলা।

সামনে গড়াগড়ি যাচ্ছে
ভাইবন্ধুদের মাথা;
পেছনে আততায়ী আমার ভাই।

হে সারথি,
রথ এইখানে থামাও।
আর আমার এই বিষাদকে
একটু ধরো।

আকাশ নয়,
গাছ নয়—
পাখির চোখ ছাড়া
আমি যেন আর কিছুই না দেখি॥

গাও হো

রেখে গেলে পথ
কঠিন ফলকে
এঁকে দিয়ে পদচিহ্ন।
হো চি মিন! হো চি মিন, হো!

নদী পর্বত
পরিখা প্রাকার:
গ্রামে বন্দরে গুহাকন্দরে
ওঠে হুঙ্কার।
শত্রুর টুঁটি ছেঁড়ে কোটি কোটি
তোমারই জাগানো সিংহ।
হো চি মিন! হো চি মিন, হো!

মুক্তিযুদ্ধে দেখালে ভিয়েতনামের বিশ্বরূপ
হাতে হাতে দিলে তুলে
বুকের রক্তে ভেজানো রঙের তুরুপ।
সারা দেশ জাগে
আজ অতন্দ্র পাহারায়—
ভালবাসা কাছে টানে মৃত্যুকে সোহাগে
জীবনকে আজ কে হারায়?
ঘৃণার বজ্রে দেখ শত্রুর শিবির ছিন্নভিন্ন।
হো চি মিন! হো চি মিন, হো!

ভাবতে পারছি না

চারদিকে
হিস্ হিস্ করছে সাপ;
সারা গায়
দংশনের জ্বালা।
এখন আমি ভাবতে পারছি না
মাঠটা পেরোলেই নদী
নদীর ধারে ঠাণ্ডা হাওয়া;
আর পেছন থেকে দৌড়ে এসে কে ছোট্ট ছোট্ট নরম হাতে
আমার চোখ টিপে জানতে চাইবে;

বলো তো কে?

আমি ভাবতে পারছি না
কেননা চারদিকে
হিস্‌ হিস্‌ করছে সাপ;
আমার সারা গায়ে
এখন দংশনের জ্বালা॥

ল্যাং

ডান কানটা বিগড়ে গেলেও
বাঁ কানটা আছে
তাইতে ধরছি কে এবং কী
ছাড়ছে ধারে-কাছে—

'আপনি, মশাই, গেছেন বদ্‌লে
বদ্‌লে গেছেন, ছি ছি!
আগে গলায় বাজ ডাকাতেন
এখন করেন চিঁচি।

'ইনাম পেয়ে জাহান্নামে
গেছেন, বলব কী আর—
প্রগতির লোক ছিলেন আগে
এখন প্রতিক্রিয়ার!

'ফুলকি ছেড়ে ফুল ধরেছেন
মিছিল ছেড়ে মেলা
দিন থাকতে মানে মানে
কাটুন এই বেলা।'

হেই গো দাদা, ছাড়ুন ঠ্যাং—
চলে যাচ্ছি ড্যাডাং ড্যাং॥

দূরত্বে

মাঝে মাঝে আমি তোমাকে পেতে চাই
চিঠি লেখার দূরত্বে;
যেখানে
আমার কথাগুলো আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে
তোমার কাছে যাবে।

আর
আমি তাদের ফেরবার অপেক্ষায়
কেবলি ঘর-বার করব
কেবলি ঘর-বার করব।

তারপর
একদিন কড়া নাড়ার শব্দে
দরজা খুলে দেখব
আমার নাম-ঠিকানায় কারা যেন দাঁড়িয়ে—

তাদের একটিও
আমার চেনামুখ নয়॥

এ ও তা

ক'রে রেখেছি বায়না
একটি হাত-আয়না
ইচ্ছেমতো নাড়ব চাড়ব
যা নড়ানো যায় না।

হব যখন ছাঁটাই
পেতে বসব চাটাই
মনের ঘুড়ি প্যাঁচ খেলবে
সুতো ছাড়বে লাটাই।

কেটে কেবল ভেংচি
খালি করেছি বেঞ্চি
খানিক পরে চেয়ে দেখি
টানছি নিজের ঠ্যাং, ছি!

বলিহারি

লিখি নি যে, কারণটা তার
নয় কো দুর্বোধ্য
জানলে লেখা যায় না কি আর
রোজ দুচারটে পদ্য?

সাধ ক'রে না-লেখার দলে
হতে চাই নি একক
কলম ঠেলি খেলার ছলে
আমি নই ঠিক লেখক।

আপনি জেতেন বাগিয়ে লেখা,
আমি অবিশ্যি হারি
কেল্লা ফতে করেন একা
সাবাস, বলিহারি॥

দুয়ো

১

আমি তো আর ফটোয় তোলা ছবি নই
যে,
সারাক্ষণ হাসতেই থাকব!

আমার মুখে তো চোঙ লাগানো নেই
যে,
সারাক্ষণ গাঁক গাঁক করব!
আমার তো হাতে কুষ্ঠ হয় নি
যে,
সারাক্ষণ হাত মুঠো ক'রে রাখব!

২

জামার নীচে পৈতে আর আস্তিনের তলায়
তাবিজ ঢেকে
এক নৈকষ্য কুলীনের ছাঁ
আমাকে পরিষ্কার বোঝান
দুনিয়াটাকে কিভাবে বদলাতে হবে॥

বাঘবন্দী

রাস্তায় কিছু একটা হলেই
আমি বাইরে আসি;
আমার মন বলে, এইবার—
হ্যাঁ,
ঠিক এইবার সব কিছু বদলাবে।

আমি খোঁজ নিই
কোন মিছিল কোনদিক থেকে আসছে.
আমি কান খাড়া করে শুনি
কার কী আওয়াজ।

তারপর আবার সব চুপচাপ।
শুধু শুনতে পাই
ঝাঁঝরিতে জল পড়ার শব্দ,
রাস্তায় শালপাতাগুলো
হাওয়া লেগে ছটফট করে।

যখন সিনেমা-ভাঙার যাত্রীদের ট্যাঁকে গুঁজে
রাত্রের শেষ ট্রাম
ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গুমটিতে ফেরে—

ময়দানের খুব কাছ থেকে
বন্দী বাঘ খাঁচার মধ্যে ডেকে ওঠে॥

বাইরে থেকে ভেতর

জল
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে
জানলায়

ঝাপসা কাঁচ
হাত দিয়ে
থেকে থেকে মুছে দিই

ভেতর থেকে যখনই আমি বাইরে তাকাই
দেখি
কেউ তার নিজের আকারে নেই

দেখি
সমস্তই নড়ে নড়ে যাচ্ছে
নিজের জায়গায় কেউই স্থির নয়

আমি এবার বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে
বাইরে থেকে
ভেতরটাকে দেখতে চাই॥

ছুটির গান

ছুটি আমার ছুটি।
        বাজলে ভোঁ—
                হাত ধোবো
                        আলগা ক'রে মুঠি।

ছুটি আমার ছুটি।
        বাঁধে যে ভিড়
                স্বপ্নে নীড়
                        তারই ডাকে জুটি॥
ছুটি আমার ছুটি।
        রইল ছক
                যা হয় হোক
                        চেলে দিয়েছি ঘুঁটি।
ছুটি আমার ছুটি।
        তুলব ঘাড়
                নামাব ভাঁড়
                        বলব, বন্ধু উঠি।

ছুটি আমার ছুটি।
        টলবে পা
                আরামে আঃ
                        বুঁজব চোখদুটি।

ছুটি আমার ছুটি।
ফিরে যা তৃষ্ণা
যা, পিছু নিস্ না
ফিরে যা রে হিংসুটি॥

ছাই

রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে এই এত বড়টা হয়েছি
এখন আর আমার
কিছুতেই কিছু হয় না

বলিহারি আক্কেল
আজকালকার সাজোয়ান ছোকরাদের

আমার পাশে ব'সে একজন
ঘটাং ঘট্ ঘটাং ঘট্
প্রাণপণে চাইছে
বাসের জংধরা জানলাটা নামাতে

ভয়
পাছে বৃষ্টির ছাঁট লেগে
টস্‌কে যায়

ওর ইচ্ছে
একদিকে একটা হাত আমিও লাগাই
তাহলে তাড়াতাড়ি হবে

দেখেও কিছু না দেখার ভান ক'রে
গ্যাঁট হয়ে
আমি দিব্যি বসে রয়েছি

দেখলে হে, দেখলে—
আজকালকার ছোকরাদের গোঁ!
জানলাটা বন্ধ ক'রে তবে ছাড়ল

বৃষ্টির বেবাক জল
এখন সেই বন্ধ জানলার শার্সিতে
কেবল তড়পাচ্ছে

ভাবখানা
যেন বাইরে গেলেই
আমাকে একহাত দেখে নেবে

ছাই!

রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে আমি এত বড়টা হয়েছি
এখন আর আমার
কিছুতেই কিছু হয় না॥

কে যায়

১

কেউ যায় না

শুধু জায়গা বদ্‌লে বদ্‌লে
সব কিছুই
জায়গা বদ্‌লে বদ্‌লে
সকলেই

থাকে।

দেখ বাপু, আমি এসেছিলাম
এই পুরোনো জায়গায়
সাদা চুলে
শেষবারের মতো একবার
মিলিয়ে নিতে

ছেলেবেলার ছবিগুলো।

যেদিকে তাকাই

জানলাগুলো
পর্দা দিয়ে ঢাকা।

ভেতরের একটা চেনা মুখও
বাইরে
আমার নজরে আসছে না।

রেলিঙের আগুন-রঙের শাড়িগুলো
পাট ক'রে
আলনায় তোলা।

রাস্তায় মাঞ্জা-দেওয়া সব সুতোই
এখন
লাটাইতে গোটানো।

দূর হোক গে—

২

পাখি উড়ে গেছে।

উড়ে গেছে আলোর নীল পাখিটা।
তাই মুখ কালো ক'রে
অভিমানে
দেয়ালে ঠিকরে আছে
মরচে-ধরা লতাপাতায়
লোহার বাসরে
শূন্য খাঁচা।

আলোর নষ্টনীড়ে উধাও
মই কাঁধে উধাও
বুড়ো বাতিওয়ালা।

হায়, উড়ে গেছে নীল পাখিটা॥

৩

দরজা থেকে এক দৌড়ে
একেবারে
মটকায় উঠে গেছে সিঁড়িটা
(যেখানে পায়রার খোপ,
যেখানে তুলসীর টব)
আবার নাচতে নাচতে এক দৌড়ে
দোরগোড়ায়

যেখানে ঠিক তার পায়ের কাছে
ভয়ঙ্কর ভারী লোহার ঢাকনায়
দম-বন্ধ-করা
সুড়ঙ্গের হাঁ-মুখ

ডাকতে গিয়ে
দরজা থেকে আমাকে ফিরে আসতে হল—
পুরোনো দিনের সঙ্গীদের নাম
এখন আর
কিছুতেই আমার মনে পড়ছে না॥

৪

তাছাড়া এও এক মজা মন্দ নয়—

একদিন যেখানে ঘেরাটোপে
কলেজেব বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামত
জজ সাহেবের নাতনি

সেখানে তিন জোয়ান তিন ধিঙ্গি
গপ্পে গপ্পে
পাড়া মাথায় করে নিয়ে চলেছে।

আমাদের কবরেজ মশাই গো—
বৈঠকখানার ফরাসবিছানা তুলে দিয়ে
তাঁর নাতিরা খুলেছে
ঠিকেদারের কেতাদুরস্ত আপিস

আর তার কত রকমের হাম্বাই
মুখোমুখি আয়না বসিয়ে
হাফ-দরজায়
চুলছাঁটার সেলুন

গোয়ালঘরে ছাপাখানা
উঠোনে লেদ

হরিসভার কানে তালা ধরিয়ে
টাইপ শেখার ইস্কুল

ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে হে দুনিয়া॥

৫

যারা ভুলে গিয়েছিল—
তারা এখন
মোমবাতিগুলো ফুঁ দিয়ে নেভাচ্ছে

তার মানে
এ-গলি একটু আগে
অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল।

ছাপাখানার চাপযন্ত্রে
গম-ভাঙার কলে
চারিদিকে আবার সব
গমগম করছে।

তার মানে
একটু আগে এলে

এক নিষ্প্রদীপ নৈঃশব্দ্যে

আমি দেখতে পেতাম
মাথার ওপর
অনন্তনীলচক্র

কান পাতলে শুনতে পেতাম
উৎসে ফিরে যাবার
ছলাৎছল শব্দ।

আমি পেছন ফিরতেই
কোথাও গনগনে আঁচে
কিছু একটা সাঁতলাবার আওয়াজে
হঠাৎ এ-গলির বুকটা
ছ্যাঁত করে উঠল॥

জল আসুক

১

সারাদিন গুম হয়ে থাকার পর
আকাশের মুখের ভাব
বদলে গেল—

এবার
যেন একটা কঠিন সংকল্পে
মন বেঁধে নিয়েছে।

সভায় কোনো বেআইনি দলের
অতর্কিতে ছুঁড়ে-দেওয়া
উত্তেজক ইস্তাহারের মতন

শূন্যে
ভর দিয়ে দিয়ে
নামছে

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না
জানলার গরাদের ওপারে
কিসের

ফিস-ফাস ফিস-ফাস শব্দ।
থেকে থেকে
ঠাণ্ডা, এলোমেলো হাওয়া।

যেন কিছুর অপেক্ষায়
পর্দাটা
সেই কখন থেকে
কেবলি ঘর-বার ঘর-বার করছে॥

২

হে জলের দেবতা
তুমি কোথায়?

লোকে অবলীলাক্রমে হেঁটে পার হচ্ছে নদী—
আমাদের পুকুরগুলোতে পাঁক;
কুয়োর এই ঘোলা জল,
হে দেবতা,
আর যে আমরা মুখে দিতে পারছি না।

তোমার পায়ে পড়ি, এই মোড়লগুলোকে নাও।
একে ওরা মুড়িয়ে খাচ্ছে,
তার ওপর গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে আমাদের রাখছে না।

বরং পাঠিয়ে দাও কিছু বেবুন
আমরা ওদের নুনজল খাইয়ে তৃষ্ণার্ত করলে
ওরা ঠিক জল বার করবে।
মাটি থেকে ওরা ঠিক খুঁজে বার করবে কন্দ।

হে জলের দেবতা,
তুমি কোথায়?

এই ভাই

দম বন্ধ হয়ে আসছে।

এই ভাই,
আমাকে একটু পাশ দিন
বেরিয়ে যাই।

বেরিয়ে
কোথায় যাব?

বনে বনে দাবানল;
খোলা হাওয়া কোথাও
নেই, কোথাও
নেই।

মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলিয়ে
শূন্যে
অহর্নিশ
শূন্যে
অহর্নিশ
পাক দিচ্ছে প্রলয়।

আর পাথরের দেয়ালে
পিঠ
ক্ষতবিক্ষত ক'রে

আমরা এ ওকে
সে তাকে
নখ দিয়ে খুঁড়ছি
দিন রাত খুঁড়ছি
দিন রাত খুঁড়ছি
রাতদিন খুঁড়ছি॥

এক অস্থায়ী চিত্র

বাঁশির শব্দে
সবুজ আলোয়
আস্তে আস্তে ছেড়ে যাচ্ছে ট্রেন।

প্ল্যাটফর্মের খালি বেঞ্চে, মনে করুন, আপনি একা
বসে বসে
শুধুমাত্র দেখছেন।

সামনেই
যেখানে যার থাকার কথা
নিজের নিজের জায়গায়

কেউ নেই।

কাছের মানুষ
মায়া কাটিয়ে
চলেছে দূর পাল্লায়।

তাকিয়ে দেখুন,
এক মুহূর্তে সমস্ত মুখ
ভিড় করেছে জানলায়—

বুকের কাছে ফুলের গুচ্ছে
নড়ছে কাছে-থাকার ইচ্ছে
ওঠানো হাত বিদায় নিচ্ছে

রুমাল উড়ছে
রুমাল উড়ছে।
হঠাৎ—

দাঁড়িয়ে গিয়ে
স্টেশনের সেই স্থিরচিত্র নড়িয়ে দিল
ট্রেন।

টেনেছিল
নিশ্চয় কেউ চেন।

আপনি তখন তাকিয়ে দেখছেন—

থেমে যাওয়ার এ-বিকৃতি
ধুলোয় ফেলে দিয়েছে স্মৃতি
খুঁজছে সবাই
পরস্পরকে ফেলে পালানোর জো।

তবেই দেখুন,
সময়মতো যাওয়ার মধ্যেই জীবনের সৌন্দর্য।।

এইও

১

আমি তখন ঘাড় হেঁট ক'রে
কুয়োর স্থির জলে
নিপুণ হয়ে দেখছিলাম
নিজেকে।

ছায়া থেকে স্মৃতি
স্মৃতি থেকে স্বপ্নে
আমার চোখ
আস্তে আস্তে ছোট হয়ে এল।

আরেকটু হলেই আমি কিন্তু
আমার ছায়াসমেত তলিয়ে যেতাম।
দেখতে গিয়ে
কখন
নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম
বুঝি নি।

বুক টান ক'রে
এখন

আমি উঠে দাঁড়িয়েছি।
আমার চোখ জড়িয়ে গিয়েছিল;
খুলে নিয়েছি।

চোখের সামনে থেকে নিজেকে সরাতেই—

আমার গোচরে
এখন
সমস্ত চরাচর;
সারা পৃথিবী
এখন আমার নজরবন্দী॥

২

রংচঙে ফানুসগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে
আমাদের মাথার ওপর
ঝোলানো হচ্ছে খাঁড়া—

এইও!
আমি সব দেখতে পাচ্ছি।

পড়ো-পড়ো দেয়ালগুলোতে
নতুন পলেস্তারা লাগিয়ে
ভাড়াটেদের অভয় দেওয়া হচ্ছে—

এইও!

আমি সব দেখতে পাচ্ছি।
দলের ভেতর দল পাকিয়ে
গদি দখলের গুজগুজ ফুসফুস—

এইও!
আমি সব দেখতে পাচ্ছি।

এবার আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে
সব

নড়িয়ে-চড়িয়ে তোলপাড় ক'রে
নিজের ছায়াটাকে পৃথিবীর গায়
ঢেলে সাজব॥

তাঁর ইচ্ছেয়

বলল:
যাও, ঠুকরে দাও।
আমি ঘাড় নাড়তে নাড়তে
ঠুকরে দিয়ে এলাম।

বলল :
যাও, খুব করে শুনিয়ে দাও।
কে কার কে
কে কার কে
ব'লে
লাল ঝুঁটি নেড়ে নেড়ে
আমি যা ইচ্ছে তাই শুনিয়ে দিলাম।

তারপর আমার গলাটা ধ'রে
আড়াই পোঁচে
শরীরটা থেকে আলাদা ক'রে
বলা হল : বহুৎ আচ্ছা,
এবার নাচো।

মাটির ওপর সমানে ধুলো উড়িয়ে
আমি নাচতে লাগলাম
ঝটপট ঝটপট!

সব তাঁরই ইচ্ছেয়॥

খেলা

খেলাটা যাদের কাছে জুয়ো—
তারা
কেউ দেবে দুয়ো,
কেউ বলবে,
'সাবাস, সাবাস! বলিহারি!'

বাঁশি বাজলে
দৌড়ে এসে বল কুড়োবে
জাল গোটাবে মালী।

যদি হারি
আমি তাঁবু পোড়াতে ছুটব না—

খেলার আনন্দে
দেব
সশব্দে হাততালি॥

এমনি ক'রে

এমনি ক'রে যায় দিন
এমনি ক'রে যায়

ডাইনে-বাঁয়ে বাঁধ দিয়ে
নদী
রাখতে পারে নাকো ঢেউ
একটিও বজায়।

এমনি ক'রে দিন যায়
এমনি ক'রে দিন।

তার চেয়ে সহৃদয় কেউ
ডাইনে-বাঁয়ে
ডানা দিত যদি
হতাম উড্ডীন।

এই ভেবে দিন যায়,
দিন যায়
দিন॥

একাকার

দেশশুদ্ধ লোক যতদিন
খেতে পায় নি
কমলালেবু—
খান নি লেনিন

এই গল্প
বলেছিলেন ধর্মভীরু বাবার বন্ধু
আমার তখন বয়স অল্প

পরে যখন বড় হলাম
পৃথিবী আর কমলালেবুর
এক আকারে
জড়িয়ে গেল লেনিনের নাম

চতুর্দিকে তুমুল তর্ক
কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে
কমলালেবুর ছবিও নাকি
খাপ খায় না ভূগোলচিত্রে

আমার কাছে ছেলেবেলার
সেই গল্পই চিরসত্য
পৃথিবী আর কমলালেবুর
এক আকারে
লেনিনের নাম মৃত্যুঞ্জয় মনুষ্যত্ব॥

জেলখানার গল্প

গাছ পাখি মাঠ ঘাট হাট দেখে
 আসছিলাম চলে—

হঠাৎ পিছন থেকে
কে যেন চিৎকাব করে ডাকতে লাগল
'কমোরে-ড।' 'কমোরে-ড।' ব'লে।

ফিরে দেখি চেনামুখ
দেখে থাকব হয়তো কোনো মিছিলে-মিটিঙে;
মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি
ভাঙা গাল, একেবারে রোগা টিঙটিঙে
খাটো ধুতি, মার্কামারা খাঁকির হাফশার্ট।

কাছে যেতে মনে পড়ে গেল অকস্মাৎ—
এক সময় আমরা সব
 একই জেলে একসঙ্গে ছিলাম,
মুখচ্ছবি মনে ছিল;
কিছুতেই মনে করতে পারলাম না নাম।
আমার কপাল,
 স্মৃতির অ্যালবামে যত ছবি
 সব নাম-মোছা।

বেঞ্চিতে বসলাম আমরা
 এসে গেল তক্ষুনি দুটো চা—
গরম গেলাস দুটো ভাঙাচোরা টেবিলে বসিয়ে
পুরোনো দিনের গল্প, সেও খুব রসিয়ে রসিয়ে,
বলা হল।
 দাঁতে দাঁত দিয়ে সব ব'সে থাকা
 কিছুতে না-খাওয়া,

সারা সিঁড়ি ব্যারিকেড, বাবান্দায় জল ঢেলে রাখা
টিয়ার গ্যাসের জন্যে, সারা রাত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি—
তবু কী আনন্দে, ভাবো,
 কেটেছিল জীবনের সেই দিনগুলি।

বলতে বলতে জল আসে আমাদের দুজনেরই চোখে।
মুখগুলো ভেসে ওঠে; মনে পড়ে
প্রভাত-মুকুল-সুমথকে।

তারপর ওঠে
আজকের দিনের কথা।
কে কোথায় আছে,
কে কী করছে—এই সব। দেখা গেল,
ভয়টা ছোঁয়াচে।

দুজনেই চুপ, কিছু ভাঙতে চায় না দুজনের কেউ।
কে আজ কোথায় আছি কোনদিকে
কোন তরফে—যেই বলা,
অমনি প্রকাণ্ড একটা ঢেউ
ছুটে এসে
দুহাতে দুজনকে তুলে
দিল এক প্রচণ্ড আছাড়।

সামনে দেয়াল শুধু,
লোহার গরাদে ধরে
বাইরে দাঁড়িয়ে অন্ধকার।
চেয়ে দেখি, আমরা আবার সেই পাশাপাশি সেলে।

নিজেদের জালে বন্দী; নিজেদেরই তৈরি-করা জেলে॥

ভালো লাগছে না

আমার ভালো লাগছে না
ভালো লাগছে না
ভালো লাগছে না—

এ জন্যে নয় যে,
দু দুটো যুদ্ধের পরেও
স্বাধীনতার যুদ্ধে আজও
মানুষ মাছির মতো মরছে।

আমার ভালো লাগছে না
ভালো লাগছে না
ভালো লাগছে না—

এ জন্যে নয় যে,
সভ্যতার মুখোশ খসিয়ে ফেলে
শয়তান বর্বরের দল
হিংস্রতায় জানোয়ারদেরও হার মানাচ্ছে।

আমার ভালো লাগছে না
ভালো লাগছে না
ভালো লাগছে না—
এই জন্যে যে,
রাক্ষসদের হাড় একদিকে, মাস একদিকে করতে পারে
রক্তবীজের বংশধর যে মানুষ
থমকে দাঁড়িয়ে তারা দেখছে।
রামলক্ষ্মণের চুলোচুলি।

আমার ভালো লাগছে না
ভালো লাগছে না
ভালো লাগছে না—

যখন দেখছি
আমরা আমেরিকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে
ভিয়েতনামকে ভাই বলছি॥

সুখে থাকো

রোদে জ্বলছে জি-টি রোড।
ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দে ডুবছে উঠছে বিড়ির দোকানে
আলী আকবরের সরোদ।
'যাবে গো' 'যাবে গো' ব'লে হাঁক দিচ্ছে সমানে ক্লিনার।
চটপট চা-পান সেরে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ভাঁড়
ড্রাইভার বসেছে সিটে;
ঠিক তার পাশটিতে মুখ টিপে দাঁড়িয়ে
সূর্যদেব নিজমুখ দেখছেন আরশিতে

সমানে কাতরাচ্ছে হর্ন
ভ্যাঁপ্‌পো ভ্যাঁপ্‌পো ভ্যাঁপো।

ভেতরে প্রচণ্ড ভিড়; বেঞ্চি জুড়ে কোলে-পো কাঁখে-পো
অস্থিসার
ষষ্ঠী মা-ঠাকরুন।
এ-কোণে বড়াই বুড়ি নিজে বাচছে মাথার উকুন।
পাশে এক ম্লেচ্ছ ব'সে—
তাই
প্যাঁচার মতন মুখ করে ঠেলছে
নামাবলী-গায়ে-দেওয়া পুরুতমশাই।

পা তুলে একলষেঁড়ে, ধুতি তুলে হাঁটুর ওপর,
পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আংটি, কোলে ট্রানজিস্টর রেডিও,
হাতে ছোট সাইজের টোপর;
জানা গেল, ষষ্ঠ ছেলেটির ভাত এবং তৎসহ
ল্যাংড়া আম বড় ভালবাসেন বি-ডি-ও।
ছুটিতে শহর ছেড়ে বাড়ি যাচ্ছে
নাইটের ছাত্র কিংবা কেরানি ওরফে—
বকলমে 'বি-ও-এ-সি' 'কে-এল এম' রোমান হরফে।
এবার সত্যিই ছাড়ছে; ইঞ্জিনের আওয়াজ প্রবল।
নেমে যাচ্ছে কমলালেবু, ঠাণ্ডা জল, চুল-বাঁধার ফিতে,
খনার বচন, ছুঁচ, সেফটিপিন
এবং গোপালভাঁড়, খেলনার পিস্তল।

হঠাৎ ক্লিনার চুপ,
ড্রাইভার পেছন ফিরে আড়চোখে তাকালো,
বাঁ-হাত গিয়ারে স্তব্ধ, বোঁটাসুদ্ধ চুন ডান হাতে—
সকলে উৎসুক।

উঠে এল বীরদর্পে
অপরূপ
অনবদ্য মুখ

টিনের সুটকেস নেড়ে 'সুখে থাকো' লেখাটুকু
দোলাতে দোলাতে॥

ছিন্নভিন্ন ছায়া

এ পথে ক্বচিৎ কদাচিৎ যায়
পোর্ট কমিশনারের রেল।

কাঠের স্লিপারে শুয়ে সারবন্দী
দুপুরে গড়ায়
রোদে-দেওয়া গেঞ্জি গামছা জাঙিয়া মেরজাই।

গলায় গর্দানে কণ্ঠী
মুণ্ডিতমস্তক চিংড়িহাটার ঘড়েল
(ঘাড় নোয়ালে
হুবহু কচ্ছপ!)
যেতে যেতে সেরে নেয় আর্দ্রবস্ত্রে ইষ্টনাম জপ—
রেলের লাইনে রেখে
গঙ্গাজলে সদ্যস্নাত খাঁচাসুদ্ধ টিয়া।

বলহরি হরিবোলে
আরো একদল এসে কাঁধ থেকে ইতিমধ্যে নামাল খাটিয়া।
শানের ওপরে কাঠকয়লার আঁচড়ে
বাঘবন্দীর ঘর কাটা;
চোখ গুলিভাঁটা
সমানে কলকেয় তোলে
নিভে আসা চুল্লির আগুন।

ডোমের মেয়েরা বাছে পা ছড়িয়ে ব'সে
এ ওর উকুন।
মাঝিরা ঘুর ঘুর করছে,
জলে ধুচ্ছে ইলিশের জাল।
এ-ডাল ও-ডাল
লেগে থেকে সারাক্ষণ এ ওর পিছনে
চোর-পুলিশ
খেলছে দুটো ফিঙে।

আঁটিবাঁধা ভিজে খড়
ডাঙার রেলিঙে
সার বেঁধে বসে খাচ্ছে হাওয়া—

পর্বতপ্রমাণ বোঝা ঘাড়ে নিয়ে
অদূরে খড়ের নৌকো।

ইনিয়ে বিনিয়ে
মৃদু দুলছে জোয়ারের জলে
ছিন্নভিন্ন ছায়া॥

আমাদের হাতে

মার্কিনী গমের আগম নিগমে
কায়কল্প শেখায়
ওদের সদ্‌গুরু!

পয়সা দিয়ে ময়দানে ভিড় জমিয়ে
ওদের কালো চশমা
দিনকে রাত করে।

ওদের বাঁধানো দাঁতের কথাগুলো
বন্দুকের অনর্গল ধোঁয়ায়
বিলক্ষণ পরিষ্কার—
দুর্গাপুরে ফিন্‌কি-দেওয়া রক্তের ধারায়
ঠিক
জলের মতন সহজ।
আমাদের চোখ যত খোলে
মুঠো তত শক্ত হয়।

ওরা বেচতে চেয়েছিল ডলারে,
আমরা বুকের রক্ত দিয়ে
কিনে নিয়েছি।

ওরা ফেলে দিয়েছিল,
আমরা তুলে নিয়েছি

স্বাধীনতার পতাকা, দেখ—
এখন
আমাদের হাতে॥

হতেই হবে

নৌকোয় জল উঠছিল সমানে।
আর আমরা সেই জল
ছেঁচতে ছেঁচতে চলেছিলাম।
অন্ধকারে ঠাহর হচ্ছিল না কোন্‌দিকে ডাঙা।
সূচিমুখ বৃষ্টির ফোঁটায়
ঝাঁঝরা হচ্ছিল আমাদের ফুসফুস।
ঠাণ্ডায় হাতে পায়ে খিল ধরে এলেও
আমরা থামি নি।

তারপর?

তারপর আকাশে রোদ হাসল,
আমরা পারে এসে উঠলাম।
এই রকম হয়,
এ রকম হতেই হয়।
নইলে কিসের জীবন
আর মানুষই বা কেন?

নজরুল, তোমাকে

ফুলের ফুরফুরে হাওয়া
　　বনে মৌমাছির গুনগুন
　　　　—সমস্তই সাময়িক,
　　　　　　সারা বছরের ছবি নয়।

এও ঠিক,
　　সময় সময়
　　　খর সূর্য
　　　　বর্ষায় আগুন।

কখনও কখনও
　　মাথার ওপর
　　　মেঘ ডাকলে

ঘন ঘন চমকায় বিদ্যুৎ
উঠে আসে ঝড়।

যখন বাতাসে ঘূর্ণি
টান লাগে শিকড়ে শিকড়ে।
তখন তোমাকে মনে পড়ে।

খুঁজি না রাস্তার নামে,
জানি নেই মর্মর মূর্তিতে—
তুমি থাকবে, তুমি আছ,
আমাদের নিত্য দুঃখজয়ের সংগ্রামে॥

পটলডাঙার পাঁচালী যাঁর

এমন মানুষ পাওয়া শক্ত
লেখার রাজ্য টুঁড়ে
এই নিচ্ছেন এবং কলম
এই ফেলছেন ছুঁড়ে

মাথায় আকাশ-ছোঁয়া যদিও
মাটিতে পা রাখেন
জমি জরিপ করেন আগে
পরে নকশা আঁকেন।

ছদ্মনামে ছাড়িয়ে যান
মান্ধাতারও আমল
একালেও দেয় পাহারা যাঁর
নীলকমল লালকমল॥

যা চাই

এখনও অনেক দেরি
বসন্তের গলায় দুলিয়ে দিতে মালা—
জানি না অজ্ঞাতবাসে আর কতকাল করবে
প্রতীক্ষা ফাল্গুন!

আকাশ দুহাত দিয়ে ঢেকে আছে মুখ,
চোখে বিদ্যুতের জ্বালা;
থেকে থেকে
অন্ধকারে জ্বলে ওঠে জোনাকির শরীরে আগুন।

আমাদের কাছে তুচ্ছ ঋতুচক্র;
কাল নিরবধি।
চোখের পাতায় স্বপ্ন সমুদ্রের,
পায়ের পাতায় লেগে লেগে
মাটি ভাঙে;
কী উল্লাসে নাচতে নাচতে ছুটে যায়
নদী।
আমিও তোমাকে কাছে টানতে চাই
কলকল্লোলিত সে আবেগে।

তোমাকে যে কথা আমি বলতে গিয়ে
হার মেনে
ফিরে ফিরে আসি:
কানে কানে গুন গুন ক'রে বলা যেত
যদি আমি
হতাম ভ্রমর।
এখন অনেক দূর থেকে
একা,
মনে মনে বলছি আমি
'ভালবাসি'।
তুমি শুনতে পেলে?
কোনো দৈববাণী?
অথবা আমার কণ্ঠস্বর?

এ সংসারে
দিনে রাত্রে
দেহ বলো, মন বলো
যখন যা চাই—
প্রেমের নিকষে ফেলে, প্রিয়তমা,
করো সব কিছুর যাচাই॥

নাটক

সুযোগ এবং সুবিধায়
   সমানে সমান হোক দশ ভাই
      কেন পাবে কেউ খুব বেশি, কেউ
         খুব কম?

যারা এই কথা ভাবল—
   ছিল না তাদের
      শুধু হাত, শুধু কলম।

      যেই তারা সারা পৃথিবীটাকেই
         ঢেলে সাজবার পক্ষে
            হাতেকলমেও হাজির করল প্রমাণ—

অমনি তাদের
   থাকল না আর রক্ষে।
      রাজার বাড়িতে রব উঠে গেল সাজ-সাজ;
         ছোটে চৌদিকে লাঠিয়াল বরকন্দাজ।
হাতে নিয়ে পরোয়ানা
   কড়া নাড়তেই
      দরজায় যায় দেখা—
         এসে দাঁড়িয়েছে ভাই-দাদা-বাবা-কাকা।
কার হাতে হাতকড়া লাগাবে সে
   কাকে সে করবে আটক?

তখন সে এক নাটক॥

সর্ষে

ডেকে বলে এক চোট্টা,
'আরে রামো রামো,
বাড়ি বাড়ি ঘুরে কেন মিছে ঘামো—
তার চেয়ে এসো
নিয়ে যাও এই নোটটা।'

তারপর কিবা ধুমধড়াক্কা
চারমন তেল পুড়ল পাক্কা।
লারে-লাপ্পায় কানে ভোঁ লাগিয়ে
জোরসে
চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলল সর্ষে

হুঁস হতে দেখি ধুরন্ধর সে চোট্টা
মেরে নিয়ে গেছে
আগামীবারের ভোটটা॥

ছত্রী

ঘরের বাইরে হুড়ুম দুড়ুম
শুনতে পাচ্ছি আওয়াজ।
সারাটা দিন যেন কাদের
চলেছে কুচকাওয়াজ।
বিকেল হলে (বেলা চারটে নাগাদ)
জানলা দিয়ে তাকাই—

আরে আরে হল একি!
বিরাট সেই বাহিনী দেখি
খুলে ফেলেছে যে যার কালো খাপ।

ভয়ে চমকে উঠে
দুপাশ থেকে খসে পড়ল
দু তিন জোড়া ইয়া লম্বা সাপ।

তারপরেতে সটান
যা থাকে কুলকপালে ব'লে
বিরাট সেই বাহিনী যেই
মাটিতে দিল লাফ—

মহানন্দে ধরে ফেলল ঠ্যাং
পুকুরপাড়ে অপেক্ষমাণ
হাজার কুড়ি ব্যাং॥

পুপের নয়

গড়গড়িয়ে রেলের গাড়ি
পুপে গেছে মামার বাড়ি।
পুপের মা পালোয়ান
গায়ে জড়িয়ে আলোয়ান
ধুঁকছে—

ব'লে উঠল নয়না
পুপের আজ নয় না?
মামা করছে আয়েস
মামী রাঁধছে পায়েস।

পুপে বেড়ায় এদিক ওদিক।
কিন্তু তার চেয়ে অধিক
শুঁকছে

পুপের বাবা
বাড়িয়ে থাবা॥

সিনেমামা

এক ডুব
দুই ডুব
তিন ডুব দেবার কালে—

উঠে এল
ছবি যে এক
পুপের মা-র জালে।

দেখে পুপে লাফায়
কড়ায় তেল চাপায়।

কোত্থেকে
এক কুমির এসে
পুরে ফেলল গালে॥

পুপের মা-র গল্প

সন্ধেটা তার ভরতেই হয়
গল্পেতে
পুপে কিছুতেই খুশি নয়
অল্পেতে।

পুপের মা কী করে—
কলকেতা শহরে!
উঠে ভোরে
গল্প ধরে
কল পেতে।

গল্পগুলো জ্যান্ত
পুপে সেটা জানত।
এক সন্ধে গেল দুধে
জল কেটে।

কেন দিল রাগিয়ে
পুপে ঘুষি বাগিয়ে

কপালদোষে
মারল ক'ষে
তলপেটে।

বদ্যি এল ছুট্টে,
ব্যাপার বিদঘুট্টে—
দেখে দুটো
বড় ফুটো
কল্‌জেতে।

বদ্যি ছিল রক্ষা
নইলে পেত অক্কা
ঘড়ি ঘড়ি
খেল বড়ি
খল চেটে।

সামলে সেই ধাক্কা
দুটি মাস পাক্কা
লেগে গেল
গায়ে ভালো
বল পেতে।

পুপে মুখ শুকিয়ে
দেখে যেত লুকিয়ে
কাচের গ্লাসে
চাইছে না সে
ঘোল খেতে।

সেদিন পুপে অবাক! দেখে
গল্পটি
সরিয়ে ফেলে কপাল থেকে
জল-পটি—
উঠে কাঠের মইতে
পুপের মা-র বইতে
যত ইচ্ছে
টান দিচ্ছে
কল্কেতে॥

তানসেন গুলি

হরতাল-টরতাল ভাঙতে হয়
এই এমনি ক'রে—
দেখলেন তো, টিপ!
চারের গোলা জলের ঠিক কোন জায়গায় পড়ল
শিখুন, শিখে নিন!
বুড়ো হাড়ে, এখনও ভেলকি খেলে মশাই—
দেখলেন তো
কব্জির জোর।

চারগুলো এখন ডুবে-ডুবে ডুবে-ডুবে
টোপের মুখ বরাবর
ফুনলে আনবে।
আহা, কী চার! কী গন্ধ!
কার হাতের মাখা দেখতে হবে তো!

হরতাল-টরতাল ভাঙতে হয়
এই এমনি ক'রে—
দেখলেন তো, আমার সেরেস্তা
সইবহরে একেবারে সেই কোনখানে গিয়ে পড়ল।
শিখুন, শিখে নিন!
দেখলেন তো কব্জির জোর!
এক কাঁটায় পিটুলি, এক কাঁটায় রুটি;
মাছ গপ্ গপ্ ক'রে খাবে।
ফাৎনা ডুবিয়েছে কি টেনেছি
আর একবার দেখে নেবেন তখন কব্জির জোর।
তারপর হাঁটতে হাঁটতে
হাঁটতে হাঁটতে
হাতিবাগানে মিষ্টি
নিউমার্কেটে শাড়ি
তা র প র বাড়ি।
হরতাল-টরতাল ভাঙতে হয়
এই এমনি ক'রে॥

রোমাঞ্চ-সিরিজ

আদরে মাথায় চড়ে গিয়েছে রামখোকা
এখন নামাতে গিয়ে মাথাটাই কাটা
যায়, দাদা! সময়ে বাছো নি কেন পোকা?

কাজ ফুরোতেই পাজী যে ছিল পা-চাটা।
তুমি যে ঢাকের বাঁয়া ছিলে তার, বোকা।
শ্রীমুখে খেউড় শুনতে গায়ে দিত কাঁটা।

বিষবৃক্ষে ভয় পাও? তোমারি তো বীজ।
পয়দা করো বাদশা আর বেগমসাহেবা—
হাতে গণতান্ত্রিকের কবচ-তাবিজ।
গাছে তুলে মই কাড়ছ এখন বারে বা!
দল থেকে করো যাকে যতই খারিজ,
অন্ধকারে, গজদন্তে তৈরি মিনারে বা

চলছে চলবে মঞ্চে তার রোমাঞ্চ সিরিজ॥

বাড়িয়ে বাড়িয়ে

পা বাড়ালেই
পিচ-ঢালা রাস্তা

আমরা চ'লে চ'লে
চ'লে চ'লে
ক্ষইয়ে ফেলেছি

চাপা-পড়া খোয়াগুলো
উঠে উঠে
এখন পদে পদে
আমাদের রুখছে।

হাত বাড়ালেই
প্রাণঢালা ভালবাসা

আমরা চেয়ে চেয়ে
চেয়ে চেয়ে
ফুরিয়ে ফেলেছি

চাপা-পড়া কথাগুলো
উঠে উঠে
এখন পলে পলে
আমাদের বিঁধছে।

একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে-দাঁড়াবার জন্যে
মনে মনে
তাকে সাহস দিচ্ছি।
ভারী দুরমুশ পেটাবার শব্দে
আমার বুকের ঘড়িতে বেজে চলেছে
টিক্
টিক্
টিক্।

লোকটা উঠছে না!

ড্রাইভার মুঠো ক'রে ধরেছে গিয়ার
কণ্ডাক্টরের হাতে ফাঁসির দড়ি
আমার বুকের ঘড়িতে
টিক্
টিক্
টিক্।

লোকটার হাতে মাত্র
চোখের এক পলক সময়॥

দেখ মাস্টের

সাদা। কালো
কালো। সাদা

চৌষট্টির টানাপোড়েনে
বারো কুঠুরির বেড়াজাল
তার মধ্যে জমিয়ে আসর
চার কামরার দমঘর
সেইখানে জোর যার
মুলুক তার।

সব বল বার করেছি হে,
রাজাকে পুরেছি কেল্লায়
বড়েগুলোকে টিপে দিয়েছি
ঘর বরাবর সামনে

মন্ত্রী ধরেও পার পাবে না হে,
ঘুঘু পড়েছ ফাঁদে

এই চালে চা
এই চালে চট

দেখ মাস্টের,
গা-ঢাকা দেওয়া উঠকিস্তিতে
এই বার
শেষ চালে তোমাকে কেমন মাত করি॥

শুধু আজ ব'লে নয়

শুধু
আজ ব'লে নয়—

রোজ

আমি তো হাসতেই চাই
আমারই গরজ।
ফুল কিনতে
পায়ে হেঁটে যে পয়সা বাঁচাই,
রেখে আসতে হয়
পথ জুড়ে হাঘরে হাভাতে
অস্থিসার হাতে।

শুধু
আজ ব'লে নয়—

খালি

আমি তো দিতেই চাই
আনন্দে হাততালি।

স্বপ্ন বন্দী
যে করেছে লাভ আর লোভের খাঁচায়
বাঁধা রাখতে হয়
তার কাছে সব গান
কলকারখানা খনি বাগিচা বাগান।

শুধু
আজ ব'লে নয়

রোজ

আমি তো বাঁচতেই চাই
আমারই গরজ।

তাই
স্বাধীনতা বুকে ক'রে
অক্ষরে অক্ষরে
আমার লড়াই।।

জলদি জলদি

জলদি জলদি...
        হ্যাট হ্যাট
        জলদি জলদি

এখন একটু পা চালিয়ে
জলদি জলদি চলো—
মুখে খই ফুটিয়ে
আমরা খুইয়ে ফেলেছি সময়

রাজা উজির যাকে যেমন মারতে হয় মারো—
কিন্তু মনে রেখো, ময়দান জুড়ে
আকাশ মাথায় ক'রে চাই
সারিবদ্ধ

ঘাস বিচালি ঘাস
ঘাস বিচালি ঘাস...

ডানায় ভর দিয়ে
আমার ক্ষিধেয় ভোঁচকানি লাগা
শব্দগুলো
গন্ধে গন্ধে উড়ে এসে বসুক একবার
মাঠের নবান্নে

শুনেছি এর ঘাড়ে ও, তার ঘাড়ে সে

শুনেছি সাদা-ভূত কালো-ভূত
শুনেছি ভূতের বেগার
আর কড়ির পাহাড়
শুনেছি জগদ্দল পাথরের কথা

ও ভাই, ওখানে দাঁড়িয়ে কে
হাপরের ওঠাপড়ায়
ফোঁস ফোঁস করছে আগুন
ও ভাই, দাঁড়িয়ে কেন
নেহাইতে রক্তের মতন লাল
গনগনে লোহা

আমি সাঁড়াশি নিয়ে বাগিয়ে ধরি
আর তুমি বিশ্বাসের তালে তালে
ঘা দাও

সময় যায়
যা করতে হবে
জলদি জলদি
সব জলদি জলদি করো।।

ভালোবাসার মুখ

আমার যাওয়া
আর না-যাওয়ার মাঝখানে
দোল খাওয়া একটা সময়
নীচে তাকিয়ে দেখি সবাই
যে যার জায়গায়
স্থির হয়ে আছে

আমার মানা
আর না-মানার মাঝখানে
একটা সংশয়

সেখানে তাকিয়ে দেখি
কী আশ্চর্য
আমার ভালোবাসার মুখ

যা রয়েছে, দেখ
তাকে বাতিল ক'রে দিচ্ছে
যা নেই।।

তোমাকে দরকার

তোমাকে আমার এখন খুব দরকার
বাইরেটা তছনছ হচ্ছে, দেখ
উল্টোপাল্টা হাওয়ায়

মাঝে মাঝে যেমন ক'রে
তুমি গুছিয়ে দাও
আমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া টেবিল

যেমন করে বার ক'রে আনো
অসম্ভব সব জায়গা থেকে
আমার জরুরি দরকারের
উধাও হওয়া কাগজ

যেমন করে ছেঁড়া কাপড় জুড়ে জুড়ে
রঙিন সুতোয়
আমাকে বানিয়ে দাও ফুলতোলা কাঁথা

তেমনিভাবে আমি চাই
তুমি আমার এই ছেঁড়াখোঁড়া
নিরুদ্দিষ্ট বল্গাহীন কথাগুলোর ড্যানা ধ'রে ধ'রে
যেখানে যার থাকার
সেখানে তাকে বসিয়ে দাও

বাইরেটা তছনছ হচ্ছে উল্টোপাল্টা হাওয়ায়
তুমি এখন কোথায়!

দুটি অনুবাদ কবিতা

চীরবাসে বীর

কবিতাকে পারি আমিও পরাতে পোশাক
ধোপদুরস্ত ছন্দে চোস্ত মিলে
পেতে পারে যাতে দস্তুরমত হুঁকো সে
যেকোনো সময় মজলিসে মহফিলে।

আমার ভাবনা বেড়ায় না গায়ে ফুঁ দিয়ে
কাটায় না দিন ফুর্তিতে মজা লুটে
সেজে ফিটফাট টেরি-কাটা ফুলবাবুটি
ফুলে ফুলে মধু খায় না সে খুঁটে খুঁটে।

আমি নিশ্চল, গর্জে ওঠে না কামান
পুরু হয়ে তাতে স্বপ্নের জং ধরে
থামে নি যুদ্ধ, বদলেছে শুধু অস্ত্র
মানুষের হয়ে মানুষের মন লড়ে।

পল্টনে নাম লিখিয়েছ যারা, তাকাও!
পতাকা আমার উড়ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে
কবিতা আমার পদাতিক, কাঁধ মিলিয়ে
পা ফেলে জোয়াল তালে তালে চারিপাশে।

উলিডুলি বেশ, তবু কী অসীম সাহসে
কঠিন আঘাত প্রাণপণে যায় হেনে
পরিপাটি কাজ নয় কো বীরের ভূষণ
বীরত্ব দিয়ে লোকে যোদ্ধাকে চেনে।

আমার কবিতা আমি মিশে গেলে মাটিতে
রবে কি রবে না, তাতে গেছে ভারি বয়ে
আমার কবিতা লড়ে সম্মুখ সমরে
দিতে হলে দেবে প্রাণ, পিছোবে না ভয়ে।

যা থাক কপালে, পবিত্র এই পুঁথিতে
চিরশান্তিতে ঘুমোবে আমার কথা
জেনো, এখানেই মিলবে বীরের সমাধি
যাদের মাথার মণি ছিল স্বাধীনতা॥

পাহাড়ে গা তোলে গোলাপ

পাহাড়ে গা তোলে গোলাপের মঞ্জরি,
কাছে এসো, বুকে বুক বাঁধো সুন্দরি!
কানে কানে বলো—, ভালবাসি।
বাঁধভাঙা সুখে আমি হই বানভাসি।

দানিয়ুবে দেয় গা এলিয়ে দিনমণি,
কী পুলকে জলতরঙ্গে জাগে ধ্বনি.
তোমাকে দোলাই বুকে নিয়ে, তাই দেখে
সূর্যকে নদী দোল দেয় থেকে থেকে।

কুলোকে যতই করুক না টিক টিক
বলুক যতই আমি ঘোর নাস্তিক!
বুকে মুখ রাখি, হৃদ্‌স্পন্দন শুনি—
শুরু হয়ে যায় বোধন, জ্বালাই ধুনি॥

ছেলে গেছে বনে

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে
উৎসর্গীকৃত প্রাণ
বাংলাভাষী ও ভারতের বহুভাষী
বীর সৈনিকদের উদ্দেশে

সামনেওয়ালা ভাগো

বুকে বাঁধছে ঢাল যতই ছেড়ে যাচ্ছে নাড়ি
ভয় পেয়ে দেখাচ্ছে ভয়
পথে বসছে ফাঁড়ি

ইষ্টনাম জপতে জপতে
   হাতে ধরল খিল
      হাতের ঠোঙা হাতেই রইল
         মিঠাই নিল চিল

ঘোড়া টিপেছে গুলি ফুটেছে হাত ছুটেছে
মাভৈ
টিপসইয়ের যা নমুনা রে ভাই
তাতে তো ভয় পাবই

ভয় পেয়েছি বিষম ভয় পেয়েছি ভয় ভীষণ
আত্মারাম ছাড়তে চাইছে
খাঁচার ইস্—
টিশন

লাঠির আগায় ফুটো হাঁড়ি কাকতাড়ুয়া
মা গো
বাজল ঘণ্টা নড়ল নিশান চলল গাড়ি
সামনেওয়ালা, ভাগো।।

অদ্ভুত সময়

এ এক ভারি অদ্ভুত সময়।

পুরোনো ভিতগুলো যখন বালির মতো ভাঙছে
আমরা ভাইবন্ধুরা
ঠিক তখনই
ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছি।

কে তার আস্তিনের তলায় কার জন্যে

কোন্ হিংস্রতা লুকিয়ে রেখেছে
আমরা জানি না।
কাঁধে হাত রাখতেও এখন আমাদের ভয়।

অন্ধকারে চেরা জিভগুলো যখন হিস হিস শব্দ করে
তখন মনে হয়
অদৃশ্য করাত দিয়ে কেউ আমাদের খুব মিহি করে কাটছে।

যখন
একসঙ্গে হাত মুঠো ক'রে দাঁড়াতে পারলেই
আমরা সব কিছু পাই—
তখন
বিভেদের এক টুকরো মাংস মুখে ধরিয়ে দিয়ে
চোরের দল
আমাদের সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে॥

হাত বাড়িয়ে রেখেছি

তোমার ঘৃণার দিকে
আমি ফিরিয়ে রেখেছি
আমার ভালবাসার মুখ

যেখানে গতি বলতে শুধুই ঘুরপাক
এগোনো মানেই দেয়ালে মাথা ঠেকে যাওয়া
সংগ্রামের আরেক নাম যেখানে নিজেকে ভাঙা

তুমি সেই অন্ধগলিতে দাঁড়িয়ে
বিপন্ন চোখের আগুনে চাইছ
আমাকে ভস্ম করে দিতে

আর আমি
তোমার অভিশাপগুলো লুফে নিয়ে
ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি আমার শুভেচ্ছা

ভোরের আজানের মতো

আমি গলা তুলে জানান দিচ্ছি
খোলা রাস্তার কোন মুখে
আমি তোমারই জন্যে দাঁড়িয়ে

হাত বাড়িয়ে রেখেছি—
অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েও
তুমি আমার হাত যাতে ধরতে পারো॥

ছেলে গেছে বনে

(সুগত মৈত্র-কে)

১
রাম তো গেলেন বনে।
দশরথ বাপ
দুঃখ যা পেলেন মনে
ছ' রাত্রেই সাফ

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, এই কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে সাতকাণ্ড বানিয়ে
কী ক'রে গেলেন তরে কঠিন এ সংসারে বাল্মীকি!
আমি যদি লিখি,
নিয়তিকে করতে আজ্ঞাবহ,
মিথ্যে অন্ধ মুনিকে টানব না।

লেখা বলতে, মনে পড়ল, ছিল বটে একদা বাসনা
লেখক হবার
শব্দবেধে ছিল দুরাগ্রহ
(তখন তো আমারও কৌমার!)

রাম রাম, এ ছি!
মার্জনা করবেন, প্রভু, অধীনের এ অবিমৃশ্যতা।
শব্দবেধ—এই কথা
নিতান্তই মুখ ফসকে বলেছি।

জল ভরবার শব্দে বাণ ছুঁড়ে আমি নই ভুলক্রমে খুনী;
আমাকে দেয় নি শাপ

শোকগ্রস্ত কোনো অন্ধ মুনি।

বুক খুলে দেখাই না লোক ডেকে ডেকে চোখের জলছাপ।
আমি নই স্ত্রীর বশ
ইক্ষ্বাকু বংশের সেই ভগ্নস্নায়ু দ্বিধাদীর্ণ মেনিমুখো রাজা।
মুখ বুঁজে সগৌরবে আমি বই কালের এ সাজা।

আমার যখন এল বানপ্রস্থে যাওয়ার বয়স—
ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
ছেলে গেছে বনে।
আমি তবু পদাতিক; হাতে বাজছে রণবাদ্য দ্রিমিকি দ্রিমিকি—

কাছে এস রত্নাকর, দূর হটো বাল্মীকি॥

২
কপালে মিন মিন করছে ঘাম।
সময় দাঁড়িয়ে আছে
মাথার ওপর তার ছিঁড়ে
যেন বন্ধ ট্রাম।

ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
মুক্তির লড়াই লড়বে ব'লে
ছেলে গেছে বনে।

পাশের টেবিলে একটা লোক
একেবারে টুপভুজঙ্গ।
সোডার বোতলে আমি ঠিক রাখছি চোখ,
কিছুতেই মাত্রা ছাড়াব না।
পুরোনো স্মৃতির সঙ্গ
নেব আজ ঝেড়ে ফেলে সব দুর্ভাবনা।

নাও যদি মেলে গাড়ি—
কাগজের নৌকো ঠেলে
জুতো হাতে হেঁটে যাব বাড়ি।

ঝরাতে ঝরাতে যাব সারা রাস্তা মাঠের শিশির,

বড়ো বড়ো ঢেউ তুলে যতই দেখাক ভয়
পাড়-ভাঙা নদী
ফিরে পেতে চাই সেই বাল্যের বিস্ময়,
যে-রোমাঞ্চ অন্ধকারে যেতে হাতে-ঝোলানো লণ্ঠনে।

ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
ছেলে গেছে বনে।

পাবে না জেনেও কাল রাত-দুপুরে বন্দুক উঁচিয়ে
দু' গাড়ি পুলিশ
সারা বাড়ি খুঁজে গেল তন্ন তন্ন ক'রে।
পেরিয়ে চল্লিশ
যে আগুন প্রায় নিবন্ত, ওরা তার তুলছে আঁচ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে।

এখনও মিছিল গেলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াই রাস্তায়
যে কোনো সভায় গিয়ে শুনি
কে কী বলে।
কেউ কিছু ভালো করলে দিই তাতে সায়।
সংসারে ডুবেছি, তাই জ্বালাই না ধুনি।

ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
ছেলে গেছে বনে।

অথচ তারই হাতে দেখছি মুক্তপাখা
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত
আমারই পতাকা॥

সফরী

দেখ্ বেটা!
ওপর-ওপর চোখ
বুলিয়ে বাইরেটা
কী রয়েছে মূলে—
না ভেঙে, না খুলে
যা আছে যেমন
রাখা-ঢাকা

বিষয়ে না ডুবিয়ে নিজেকে
এও এক রকম ক'রে দেখা
যেতে যেতে
রাস্তা থেকে
কিছুর ভেতর কিছু
নয় যেন
এমনি ক'রে জানো

দেখ্, বেটা!
রং ঢং দিয়ে টানে
যেটা
কোনটা ঠুন্‌কো
কোনটা বা টেঁকসই—
যে নয় বিষয়ী
তার কিছুই আসে যায় না

এও এক রকম আয়না
ফোটাতে পারলেই
ব্যস্, খুশি

তার কাছে নেই
বাইরে ডানা-কাটা পরী
ভেতরে রাক্ষুসী—
হ' তুই সফরী।

দেখ্, বেটা!
ওপর-ওপর চোখ
বুলিয়ে বাইরেটা।

খেলা হবে

দেখুন, আলকাতরানো দেয়ালগুলো
এখন চুনকালিতে ছয়লাপ
মশাইরা, দাঁড়িয়ে যান—
খেলা হবে খেলা।

ঝাপসা চোখে চশমা লাগান
দেখতে পাবেন হাড়হদ্দ।
একবার ফিনকি দিলেই
সব লালে লাল।

পটাশ দিয়ে ফটাস হবে
ঘোড়া ছুটবে তেরে কেটে তাক
হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে
দেখাব আপনাদের বাইশ কোপের খেলা।

আর পাঁচ মিনিট। আর পাঁচ মিনিট।
মশাইরা, দাঁড়িয়ে যান—
পড়ে যাবে আরও একটা লাশ।

খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে খেলা॥

মধ্যে যুদ্ধ

জানা ছিল নাম।
        বয়সে এবং
                মনে ছিল রং।

ধরে ফেঁতাম
        তাকে ইস্ আর
                একটু হলেই।

ধরব বলেই
        শূন্যে হে খোদা

করেছি একদা
পাখা বিস্তার।

হয় নি আলাপ।
দেখেছি এ ওকে
শুধু চোখে চোখে।

দিতে যাব লাফ—
কে যেন হঠাৎ
টেনেছিল হাত।

ছেড়ে দিল ট্রাম।
তাকে ইস্‌ আর
একটু হলেই
ধরে ফেলতাম।

যুদ্ধের ত্রাসে
আলো নিবোলেই
সেই কবেকার
স্মৃতি উঠে আসে॥

লাগসই

যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র বাস্তবিক ছিলেন না ঈশ্বর
তাঁকে ধরা যেত
মানুষের দুঃখ দেখলে হতেন কাতর
অতএব লোকে করত তাঁকেই পাকড়াও
এবং কিছু না কিছু প্রত্যেকেই পেত
যে যেমন জানাত প্রার্থনা

তাও
পেলে পরে ভুলে যাবে মানুষ সে পাত্র না
প্রতিদানে ঢিল
ছুঁড়েছে সে সজোরে পাঁজরে

মুখটা ব্যথায় নীল
অতএব লেগেছিল ঠিক

যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন না ঈশ্বর বাস্তবিক॥

রসুই

বাবুমশয়
আপনি সায়েব
আমি আপনার বাবুর্চি

হয়ে গায়েব
পর্দার পাছে
চৌপহর দিন চৌকার আঁচে
খোদা জানেন
যা পুড়ছি

করছি তৈয়ার
ফরমাচ্ছেন যা

হুজুর, আমার মনোবাঞ্ছা
পূরণ হয় না
নিজের রান্নায়

খানা আমার
বিবি বানায়

ঘরে যাবার আগে, হুজুর
ভালো ক'রে হাত ধুচ্ছি॥

ধরাবাঁধা

আয়না আয়না আয়না
সবাই দেখে নিজেকে, কেউ তোমাকে দেখতে চায় না।

গলি গলি গলি
এই বললে বসে থাকব, এই বলছ চলি।

রোয়াক রোয়াক রোয়াক
তোমায় দেখে গ্যাসের আলোর রাত্তিরটা পোহাক।

রাস্তা রাস্তা রাস্তা
শুয়ে শুয়ে দেখছ বুঝি হাঁ-করা আকাশটা।

ছাদ ছাদ ছাদ
পুপের জন্যে টুকুর জন্যে বেঁধে আনো তো চাঁদ॥

চর্যাপদ থেকে

১

কায়া তরু ; তার পাঁচখানি ডাল।
অধীর চিত্ত, অন্তরে কাল।
লুই বলে, মহাসুখের প্রমাণ
পাবে, করো সদ্‌গুরু সন্ধান।
সুখ ও দুঃখে যখন এ ভবে
মৃত্যুই ধ্রুব; সমাধি কী হবে?
এড়িয়ে ছন্দোবদ্ধ নিগড়
শূন্য পক্ষ করে থাকো ভর।
ধ্যানস্থ হয়ে দেখেছি এ দুই
প্রাণায়ামে ব'সে বলছেন লুই॥

২

ভবনদী বয় গম্ভীর খরবেগে—
মাঝে নেই থই; দুই পাড়ে কাদা লেগে।

চাটিল বেঁধেছে তাতে ধর্মের সাঁকো
নির্ভয়ে পার হয় লোক লাখো লাখো।
মোহতরু চিরে পাটি জোড়া হল খাসা।
অদ্বয় দৃঢ় টাঙি নির্বাণে ঠাসা।
ডান-বাঁ হয়ো না সাঁকোটাতে চড়ো যদি
যেও নাকো দূরে, নিকটেই আছে বোধি।
চাটিল হলেন সকলের বড় সাঁই
তাঁকেই শুধাক যারা পার হতে চায়॥

৩

কাকে যে ধরেছি, ছেড়েছি বা কাকে?
চৌদিক থেকে বেড় দেয়, হাঁকে।
আপন মাংসে হরিণ বৈরী।
শরসন্ধানে ভুসুকু তৈরি!
খায় না হরিণ— না জল, না ঘাস।
জানে না কোথায় হরিণীর বাস।
হরিণী বলেছে, 'ও হরিণ, শোন্—
দূরে চলে যা রে, ছেড়ে এই বন।'
ছুটে গেল, দেখা গেল নাকো খুরও।
ভুসুকুর কথা বোঝে না যে মূঢ়॥

৪

দোয়ালো কাছিম, উপচে পড়ল কেঁড়ে।
গাছের তেঁতুল কুমিরে খেয়েছে পেড়ে।
শোন ওরে বউ, উঠোনেই ঘরদোর।
কর্ণাভরণ মাঝরাতে নিল চোর।
শ্বশুর ঘুমোয়, বধূ একা জেগে আছে—
কর্ণাভরণ চেয়ে নেবে কার কাছে?
দিবাভাগে বধূ কাকের ভয়েতে চুপ।
রাতের বেলায় চলে যায় কামরূপ!
কুক্কুরীপাদ এ চর্যাগীতি গায়—
কোটির মধ্যে একের মর্মে যায়॥

৫

আলিতে কালিতে পথ গেছে ঠেকে।
কাহ্নু বিমনা হল তাই দেখে।
করবে কাহ্নু কোথা বসবাস—
যে মনোগোচর সেই যে উদাস।
তিন তিন বটে; তিন অভিন্ন
ভবসংসার পরিচ্ছিন্ন।
যারা যারা আসে ফিরে চলে যায়।
কাহ্নু বিমনা সে আনাগোনায়।
ঐ তো, কাহ্নু, জিনপুর ঐ—
অন্তরে তবু সাড়া জাগে কই॥

উর্দু থেকে

শাহ্‌রিয়ার-এর দুটি কবিতা

১

এইমাত্র
একটা আওয়াজ ঢেউ দিয়ে গেল দরজায়
এইমাত্র
কানে কানে ফিসফিসিয়ে গেল একটা কথা
এইমাত্র
একটা মিষ্টি গন্ধ হাত বুলিয়ে গেল আমার গায়
এইমাত্র
আমার ঘরে ঢুকেছিল একটা ছায়া
আর ঠিক তখনই
ঘুমের দেয়াল ধ্বসে পড়ল
ঠিক তখনই
সাঁই সাঁই ক'রে ছুটল হাওয়া॥

২

এই দিগম্বর অন্ধকারে নৈঃশব্দ্য ছাড়া কীই বা আছে
শুধু শূন্যতা, শুধু হাহাকার, শুধুই পিপাসা

এখানে যে জন্যে তুমি এসেছ
কোনো দামেই তা মিলবে না
সঙ্গে ক'রে যা এনেছিলাম
তাড়া না করলে তাও খোয়া যাবে
চলো, তাড়াতাড়ি চলো নিজের ঘরে

যেখানে দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করছে
যে দিন চলে গেছে
তার করাঘাত॥

রুশ থেকে

ৎভারদভ্স্কির একটি কবিতা

যা জানবার আমি নিজে নিজে জানব।
আমার যা কিছু ভুল
আমি নিজেই বার করব।
সমস্তই আমি জানব মনপ্রাণ দিয়ে—
পরের জোগানো বাঁধাগৎ দিয়ে নয়।
এ থেকে ভালো কিছু হবে না
—হাস্যকর আত্মপক্ষসমর্থনে আমি কি রকম ফেঁসেছি।
দয়া ক'রে আমার অন্তরপুরুষকে চোখে চোখে রেখো না,
আমার কানে মন্ত্র দেবার কোনো দরকার নেই॥

তু-ফু-র দুটি চীনা কবিতা

বসন্ত দর্শন

একেবারে দলিতমথিত আমাদের দেশ,
শুধু নদী আর পাহাড়ই যা আগের মতন,
শহর ভরে গেছে
বড় বড় গাছ আর বসন্তের উলুঘাসে।
আমাদের এমন দুঃসময় দেখে
ফুলেরাও চোখের জল ফেলছে,
লোকে তাদের প্রিয়জনদের ছেড়ে যাচ্ছে দেখে
পাখিরাও দুঃখে কাতর।

এই তিনটি মাস
সমানে
জ্বলে জ্বলে উঠছে সাঙ্কেতিক ইশারার আলো,
এদিকে বাড়ির একটা চিঠিও
আজ সোনার চেয়ে দামি।
আর আমি মাথা চুলকোতে গেলেই বুঝি
পাকা চুলগুলো এমন পাতলা হয়ে গেছে যে—
কাঁটা দিয়েও আর সামলানো যাচ্ছে না॥

গাঁয়ে ফিরে

১

সমতলে ঢলে পড়েছে অস্তগামী সূর্য,
পশ্চিমের তুঙ্গী মেঘ ক্রমেই লালে লাল হচ্ছে।
বেড়ার গায় কিচির মিচির করছে চড়ুই,
আর দীর্ঘ রাস্তা ঠেঙিয়ে এখন আমি বাড়ির দোরগোড়ায়।

বউ ছেলেমেয়েরা নীরবে চোখের জল ফেলে
আমাকে দেখে অবাক হয়ে ছুটে এল:
এখন সারা পৃথিবী লড়ছে
ঘরের মানুষ ঘরে আসা সহজ নয়।

বাগানের দেয়ালে উঁকি দিচ্ছে পড়শিদের মাথা,
যেদিকেই কান পাতো
শুনতে পাবে হাসিমুখের সচকিত ফিসফাস।
রাত নিশুতি হলে মোমবাতির আলোয় আমরা বসি,
স্বপ্নাবিষ্টের মতো আমি
একদৃষ্টে চেয়ে দেখছি আমার প্রিয়জনদের মুখ।

২

এখন আমার পড়ন্ত বয়স, জীবনের বেশির ভাগই গেছে যুদ্ধে,
আজও ঘরে-ফেরাটা আমার কাছে খুব সুখের নয়।
আমার আদুরে ছেলেটা সারাক্ষণ থাকে আমার পাশে পাশে,
তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে আমাকে সে ছেড়ে যায়।

আমার মনে পড়ে, যখন আমি রওনা হই
তখন ছিল নিদাঘ—
লোকে যখন ঠাণ্ডা খোঁজে, গাছের ছায়ার ধার দিয়ে হাঁটে,
পুকুরের ধার দিয়ে দিয়ে।
আমি যখন ফিরে এলাম, তখন রীতিমতো শীত,
সাঁই সাঁই করছে উত্তুরে হাওয়া,
আমার এখন উদ্বেগের অন্ত নেই,
কিন্তু আমি সান্ত্বনা পাই যখন শুনি
মাঠের ফসল আমরা ঘরে তুলেছি, চোলাই শেষ,
শেষ দিনগুলোতে আমাকে সাহস দেবার মতো
যথেষ্ট মদ আমাদের মজুত।

৩

আমাদের মোরগগুলো গলা ফাটিয়ে
কী চিৎকারই না জুড়েছিল,
অতিথিরা আসার সময় কী মোরগ-লড়াই
কী পাখা ঝাপটানি—

আমি যখন তাড়া ক'রে তাদের গাছে তুলে দিলাম,
তখনই আমার কানে এল পড়শিরা দরজায় ডাকছে।
চার-পাঁচজন বুড়োর একটা দল এল
দীর্ঘ পথযাত্রার জন্যে অভিনন্দন জানাতে--
তাদের প্রত্যেকের হাতেই একটি ক'রে উপহার।
আমরা সবাই মিলে ব'সে কাঠের পাত্রে
আমার জন্যে ওদের আনা মিষ্টি মদ ঢক ঢক ক'রে খেলাম।

ওরা বলল, 'নিরেস জিনিস।'
কেননা জোয়ারের ক্ষেতে এবার চাষ হয় নি।
সৈন্যদলে লোক ভর্তি কখনও শেষ হয় না।
ছেলেরা পুবদেশে গেছে ফৌজিদের সঙ্গে....

উত্তরে আমি বললাম : 'আমি তোমাদের একটা গান শোনাই....
কষ্টের দিনে তোমাদের সাহায্য পাওয়া
কী যে মধুর কী বলব....'
গুনগুনিয়ে গান গাওয়ার পর

আমি আকাশের দিকে তাকালাম।
তারপর এর-ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি
আমাদের সকলের চোখই জলে ভেজা।।

এরিখ ভাইনার্ট-এর একটি জার্মান কবিতা

পাথরকুচির গান

আমরা ছিলাম ঘুমন্ত হিমজমাট পাথর
শত সহস্র বছর ধরে;
ভেঙে গেল ঘুম বারুদকাঠির কঠিন ছোঁয়ায়
বিকোলাম শেষে বাজারদরে!
পাষাণস্থলীতে গাঁইতির মুখে ছিটোয় আগুন
হাঁক দেয় কুলি হেঁইও-হেঁই,
অঞ্জলি ভরে নিয়েছি আমরা—দিয়েছে দু'হাতে
শরীরের স্বেদশোণিত সে-ই।

ভেঙে গুঁড়ো ক'রে ঢালে আমাদের পথের ধুলোয়,
দুরমুশ করে সমানে পিটে;
ফোঁটায় ফোঁটায় কপালের ঘাম মাটিতে শুকোয়
পাথরে থিতোয় নুনের ছিটে।

পায়ে চাকা বেঁধে গড়াতে গড়াতে বাঁধানো সড়কে
ছুটে যায় গাড়ি কাঁপিয়ে পাড়া,
তবু অহরহ অনুভব করি পাষাণহৃদয়ে—
যারা কাজ করে তাদের সাড়া।

একদা হঠাৎ হাজার পায়ের দৃপ্ত আওয়াজে
শুনি মিছিলের গর্জে ওঠা
মজুরেরা গায়, কণ্ঠে আমরা কণ্ঠ মেলাই
পায়ে মাথা কোটে আলোর ছটা।

ছুটে এসে লাগে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চোখের নিমেষে—
আগুনের ঝড়, ধোঁয়ার আঁধি;
পথ ঢেকে যায় মাথার খুলিতে; আমরা পাষাণ—
রক্তগঙ্গা জটায় বাঁধি।

ওরা খুঁড়ে খুঁড়ে আমাদের টেনে ওপরে ওঠায়
সামনে বাধার দেয়াল তোলে;
বন্দুকে গুলি ভরে নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়,
দু'চোখ তীব্র ঘৃণায় জ্বলে।

মাথার ওপর ফের ওঠে ঝড়, অগ্নিবৃষ্টি!
বুকে করে রাখি বন্ধুদের;
এ পাষাণকায় বজ্রমুঠির প্রবল প্রতাপ
শত্রুরা দেখ পাচ্ছে টের।

পাষাণ এ প্রাণ ব্যথায় কাঁদছে; হবে না ব্যর্থ
মজুরের এই রক্ত ঢালা;
কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াব আমরা—হে সাথী, হে বীর!
সমাধিতে পাব জয়ের মালা॥

তিনটি পুরোনো গ্রিক কবিতা

প্রেমগীতি

ওঠো, উঠে পড়ো, দোহাই তোমার, যাও
এ কী ঘুম, গলা ভেঙে গেল ডেকে ডেকে
কেন দেরি ক'রে আমার বিপদ ঘটাও
সে এসে হঠাৎ দুজনকে যদি দেখে?

শেষকালে এই ছিল, হা আমার কপাল—
ধরা পড়ি যদি, দুজনেরই হবে খোয়ার
জানলায় দেখ আধফুটন্ত সকাল
পায়ে পড়ি, ওঠো, উঠে পড়ো, প্রিয় আমার॥

হতাম যদি হাওয়া

তুমি ব'সে আছ নির্জন উপকূলে
আমি যেন কোনো সমুদ্রচারী হাওয়া
কেবলি তোমার বুকের আঁচল তুলে
হাতড়াই যাতে হৃদয়টা যায় পাওয়া॥

হতাম লাল গোলাপ

আমায় তুমি তুলবে জানলে
হতাম লাল গোলাপ
তোমার পাণিপ্রার্থী হতাম,
জীবনসঙ্গিনি!

লজ্জা এঁকে দিত অঙ্গে
আরক্তিম ছাপ
তোমার বুকে মুখ রাখতাম
যখন, হে রঙ্গিনি॥

রাইনর মারিয়া রিল্‌কে্‌-র

শরতের দিন

সময় হয়েছে, প্রভু। গ্রীষ্ম ছিল ভারি।
শঙ্কুপট্টে ছুঁড়ে মারো নিজের ছায়াকে।
মাঠে ছেড়ে দাও হাওয়া খেলুক বেচারি।
আজ্ঞা করো, ফল পুষ্ট হোক তরুশাখে;
আর মাত্র দুটো দিন রোদ রাখো পুষে;
তুমি বললে ফল পেকে হবে টুসটুসে,
পাঠাবে মধুর তত্ত্ব গাঢ় মদিরাকে।

ঘর গড়া হবে নাকো—যে আজো হা-ঘরে,
এখনও যে একা, তাকে থাকতে হবে ব'সে,
ভাঙবে ঘুম, পড়বে বই, চিঠি লিখবে ক'ষে
অস্থির হৃদয়ে ঘুরবে এ-মোড় ও-মোড়ে—

শুক্‌নো পাতা গাছ থেকে পড়বে খসে খসে॥

হেরমান হেস্‌সে-র

যৌবন যায়

ক্লান্ত নিদাঘ, মাথাটা পড়েছে ঢলে ;
ভাসা-ভাসা তার জলছবি ডোবা জুড়ে।
পথ বন্ধুর, ভয়াল ; শরীর টলে—
ছায়াঢাকা বনবীথি সে অনেক দূরে।

একা দলছুট ভীরু হাওয়া যায় বয়ে।
পিছনে আকাশ চোখ লাল ক'রে আছে
আলো পড়ে এলে ভরসন্ধ্যার ভয়ে
গুটি গুটি এসে মৃত্যু ঘেঁষবে কাছে।

পথ বন্ধুর, ভয়াল ; শরীর টলে—
ফিরে দেখি দূরে যৌবন হাত নেড়ে
বলে : এসো। তার দু'চোখ ভিজছে জলে।
সে আজ আমাকে চিরতরে যায় ছেড়ে॥

দূরভাষ

এখনও অনেক দেরি বসন্তের গলায় দুলিয়ে দিতে মালা
জানি না অজ্ঞাতবাসে আর কতকাল করবে প্রতীক্ষা ফাল্গুন
আকাশ দু'হাত দিয়ে ঢেকে আছে মুখ, চোখে বিদ্যুতের জ্বালা
থেকে থেকে অন্ধকারে জ্বলে ওঠে জোনাকির শরীরে আগুন।

আমাদের কাছে তুচ্ছ ঋতুচক্র ; জেনে রেখো, কাল নিরবধি
চোখের পাতায় স্বপ্ন সমুদ্রের, পায়ের পাতায় লেগে লেগে
মাটি ভাঙে, কী উল্লাসে নাচতে নাচতে ছুটে যায় নদী
আমিও তোমাকে কাছে টানতে চাই কলকল্লোলিত সে আবেগে।

তোমাকে যে কথা আমি বলতে গিয়ে হার মেনে ফিরে ফিবে আসি
কানে গুন গুন ক'রে বলা যেত যদি আমি হতাম ভ্রমর
এখন অনেক দূর থেকে একা মনে মনে বলছি : ভালবাসি—
তুমি শুনতে পেলে কোনো দৈববাণী? অথবা আমার কণ্ঠস্বর?
এ সংসারে দিনে রাত্রে দেহ বলো, মন বলো যখন যা চাই
প্রেমের নিকষে ফেলে, প্রিয়তমা, করো সব-কিছুর যাচাই॥

খাঁচা-ছাড়া

লেখকের দল।
একদিকে জল
একদিকে দানা।
বসিয়ে খাঁচায়।
ওরা লেখা চায়।

খাঁচা ভেঙে তাই
মেলছি ডানা॥

'নিশির ডাক' নাটকের গান

আশার কপালে চন্দন দিলাম
চন্দন লাগল না
বন্ধুর হৃদয়ে বন্ধন দিলাম
বন্ধন থাকল না।
সারাটা দিন জুড়ে দেখলাম
রাতের হাতছানি
দিনের চোখে স্বপ্ন দিলাম
রাতের চোখে পানি
হাটে হাটে বেচলাম প্রদীপ
ঘরে সন্ধ্যা জ্বলল না।

যেদিকে হাত বাড়াই যখন
যেদিকেতে চাই
চোখে ঠেকে আঁধি-আঁধার
হাতে ঠেকে ছাই।
চোখের মণি জ্বেলে খুঁজলাম
সাপের মাথার মণি
চোখ বুঁজেই খুঁজে পেতাম
বুকের মধ্যে খনি।
জীবনে যার সন্ধান করলাম
সন্ধান মিলল না।

বায়নাক্কা

গুড়গুড়ে পাখি এক
পুছে বাত নিয়ত
পাগুড়িতে ঢাক ঢাক
গুড় গুড় কী অত

বলে দাদা শুনে সব
ভুরু দুটো কুঁচকে
কত বড় বেআদব
ঐটুকু পুঁচকে

অবিশ্যি এও ঠিক
মাথা সাফ থাকলে
বেঁধেছেঁদে চারিদিক
রাখা চাই আগ্‌লে

নইলে তো ছেড়ে নাক
টাক-ডুম ডুম-টাক॥

ম্যাও

ওরা তো সব কাগুজে বাঘ
আমি বাঘের মাসি হে
আমার ওপর করলে রাগ
দেব না ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে!

নরম মাটি পেলেই আমি
শানিয়ে নিই নখ হে
মানবে না যে গৃহস্বামী
নেই কো তার রক্ষে।

দেহ ক্লান্ত, দুয়োরে খিল
ভাবছ দেবে ঘুম কি?
তার আশা নেই, টপকে পাঁচিল
অ্যায়সা দেব হুমকি!

কাগুজে বাঘের পায়ের ধুলোয়
আমারই এখন দিন হে
মিনির দলে আমিই হুলো
চিনে নাও দাগচিহ্নে॥

ভিয়েতনামে শোনা একটি গান

একটু আগে তুমি ছিলে মাথার ওপর
আর
আমি মাটিতে।
মেঘ থেকে বজ্র খসিয়ে খসিয়ে
নীচে
লাল পিঁপড়ের মতো
আমাকে তুমি দেখছিলে।

এখন
আমি তোমার মাথার ওপর
আর তুমি টান টান হয়ে
মাটিতে।
কৃমিকীটের মতো তোমার মুখ
আমি নিচু হয়ে দেখছি।

দেখেশুনে

লেনিনগ্রাদ থেকে চলেছি স্কোফ
চার মহাদেশ চাপিয়ে দুই বাসে
জানলা দিয়ে দেখায় বায়োস্কোপ
রোমাঞ্চকর দৃশ্য রুদ্ধশ্বাসে
পিছিয়ে যায় পায়ে লাগিয়ে চাকা
যৌথখামার দোকানপাট বাড়ি
উড়ছে নামছে মাথায় ক'রে পাখা
হেলিকপ্টার।
সমানে হাত নাড়ি।
চোখের কাছে হার মেনেছে ভাষা।

চার মহাদেশ সারাটা পথ যেন
দু'হাত দিয়ে ছড়ায় ভালবাসা।

খুঁটিয়ে দেখি। হিসেব চাই। কেন?
এই মাটিতে বুনেছি সব আশা॥

দেয়ালে লেখবার জন্যে

হাত জোড় ক'রে নয়, হাত মুঠো ক'রেও নয়।
পেতে হলে হাত লাগাতে হবে॥

ভেতরে যত নরম। বাইরে তত গরম॥

দিনে দিনে হয়। রাতারাতি হওয়ার নয়॥

ঘৃণা ফেলে। ভালবাসা তোলে॥

শ্রেণী থাকবে না, মানুষ থাকবে॥

জীবনের জন্যে মৃত্যু, মৃত্যুর জন্যে জীবন নয়॥

আরম্ভে দেশ। দুনিয়ায় শেষ॥

যে ভাগে সে ভাঙে।
যে লড়ে সে গড়ে॥

উঁচুকে নিচু নয়, নিচুকে উঁচু করো॥

পরেরটা ঘোচায়। নিজেরটা গোছায়॥

এক হলে পারি। একা হলে হারি॥

বাঁধলে জোট, বাড়বে জোর॥

টুটলে বাঁধন, বাড়লে মান।
তবেই হবে সবাই সমান॥

আগে পাও যা দাও।
পরে নাও যা চাও॥

কথার সঙ্গে মেলাও হাত।
তাহলে হবে কিস্তিমাত॥

কে বা কারা

কে বা কারা নিয়েছিল মাথার ওপর তার কেটে
কাজেই ছ-ঘণ্টা লেটে
যখন ডানকুনি ছেড়ে ধূধূ-করা মাঠে ঠা-ঠা রোদে
থেমে গেল
ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত রাতজাগা দূরাগত ট্রেন
সামনে দেখি নৃশংস আমোদে
পথ আটকে হ্যা হ্যা ক'রে হাসছে ধৃষ্ট সিগন্যালের আলো

বাইরে তরজা; থেকে থেকে চলছে মুখখিস্তির চিতেন
গালে-কাটা-দাগ এক খেঁড়ু
কেবিনের দিকে ফিরে দেখাচ্ছে আঙুল
চাপান-উতোরে দিব্যি লড়ে যাচ্ছে কুমেরু সুমেরু
সরু হচ্ছে মোটা আর সূক্ষ্ম হচ্ছে স্থূল

অন্য দৃশ্য কামরায় কামরায়
খিধেয় ভোঁচকানি লেগে বাচ্চারা কাতরায়
গরমে আনচান করছে থেমে-থাকা ট্রেনে
অসুস্থ অশক্ত বুড়োবুড়ি
কেউ বা ঘড়ির দিকে রক্তচক্ষু হেনে
করতে চাইছে সময়ের ওপর গা-জুরি

চারদিকে দেয়ালে ছাদে মোচড়ানো দোমড়ানো ভাঙা-চাঁছা
জলের বেসিন, ট্যাপ, আয়না, ডুম, সুইচ, হাতল
শূন্য ক'রে খাঁচা
মাথার ওপর থেকে হাওয়া হয়ে গেছে সব পাখা
হাতের নাগালে আছে রাখা
একমাত্র শিকল

হঠাৎ সারাটা ট্রেন ঝুঁকে পড়ল জানলায় জানলায়
কে বা কারা দিবালোকে
সটান ইঞ্জিন থেকে সরাচ্ছে হায়-হায়
সমানে ব্যাটারি
গালে যাঁর কাটা দাগ রাগে অগ্নিশর্মা সে বেচারি
এই নামে এই এসে ঢোকে

ডিউটি শেষ, জুতো থেকে খুলে ফেলে ফিতে
তিন তিনটি বন্দুকধারী ব'সে আছে পা তুলে বেঞ্চিতে
যে দল ডিউটিতে আছে
ধারাপাত শুভঙ্করী ইত্যাদিতে সকলেই ব্যস্ত ধারেকাছে

মিটে গেলে কাজকর্ম, দ্বিতীয় অঙ্কের
পালা শুরু হয়ে গেল দ্রুতগতি ট্রেনের কামরায়
এতক্ষণ পাওয়া যায়নি টের
সাজঘরে মেক্‌আপ নিয়ে ব'সে ছিল এত কুশীলব
দরজা খুলে ক্রমাগত আসে আর যায়

তারা সব
চলন্ত ট্রেনের ছাদে উঠে গিয়ে
ট্রেনের তলায় ঢুকে দেখাচ্ছে কসরত
খালি হাতে যাচ্ছে তারা বস্তা থলি সমানে জুগিয়ে
কি ম্যাজিক, মূষিকের পেট থেকে বেরোচ্ছে পর্বত

ছাড়িয়ে গঙ্গার পুল গন্তব্যে না পৌঁছুতে পৌঁছুতে
আবার ঘচাং ক'রে থেমে গেল ট্রেন
তারপর মাটিতে ঝুপঝাপ
গালে যাঁর কাটা দাগ তিনি কিন্তু দিলেন না মাটি ছুঁতে
দয়া ক'রে ধ'রে দিন তো ভাই
আমাকে বললেন

দুপুরে আপিসে পৌঁছে তিন অঙ্কে সাঙ্গ হল আমার ধরতাই॥

নিয়ে যাব শহর দেখাতে

১

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

ক্যাম্পে ট্রেনিং শেষ
তার হাতে
মাত্র চার প্রহর সময়।

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

চোখের ওপর আর নয়
গাল বেয়ে
নেমে এসে বুকের পঞ্জরে
হাত দাও, কান রেখে শোনো
দেখ চেয়ে—
অগ্নিগর্ভ কালের গহ্বরে
স্পন্দমান
দেশ।

নিয়ে যাব শহর দেখাতে॥

যা ছিল না সুস্পষ্ট কখনও
শুধু ভাসা-ভাসা
যার স্থান
সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে
ভেঙে গিয়ে সে মেঘকুয়াশা
জল হয় যদি—
ফলন্ত ফুলন্ত হয় মাটি,
মুক্তিযুদ্ধে
শিরায় শিরায় নেচে ওঠে রক্তনদী।
নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

জীবনকে সমানে সাধে আদরে-আহ্লাদে
ঘৃণা দিয়ে মৃত্যুকে ফেরায়,
কাঁধে দিয়ে কাঁধ, হাতে হাত বাঁধে
শতদলে ফোটায় একফুল

পার হয়ে জলস্থল ডাঙা-ভাঁটি
চড়াই-উৎরাই
শুইয়ে দিয়ে গাঁ-শহরে বসানো পুতুল
জয় ক'রে দুঃখক্লেশ
সে করবে দেশজয়।

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।
ক্যাম্পে ট্রেনিং শেষ
তার হাতে
মাত্র চার প্রহর সময়।

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

২

সামনে থেকে স'রে যাও,
উঠে ব'সো ময়লা-ফেলা রাস্তার ডাস্টবিনে—
দেয়ালে পা ফাঁক ক'রে চোখ-মারা তারকা-রাক্ষুসি!
দোকানে শো-কেসে স্টলে সাজাও যা খুশি।

সুবেশে পকেটমার নারীমাংসলোভী বইপুঁথি
সামনে থেকে সরাও এক্ষুনি।
যেন মুখ দেখায় না রং-কানা
ভ্রাতৃরক্তে হাত-রাঙানো খুনী।

অহল্যা পাথরে মাথা ঠুকে যারা করেছ দু'খানা
কাস্তে ও হাতুড়ি
দেশ দিয়ে জাহান্নামে, হয়ে নিজে দুনিয়ার বার—
স'রে যাও, স'রে যাও এসো না সাক্ষাতে!

আমি যাচ্ছি শহর দেখাতে॥

সময়ের জালে

১

নিজের হাতের ঘড়ি
চব্বিশ ঘণ্টায়
মাত্র একবারই দেখি—

ন'টায়
ভোঁ বাজলে।
দিন কোথা দিয়ে যায়
রাত কোথা দিয়ে যায়
আমি খবরই রাখি না।

খবরের কাগজের পাতায়
সকাল হয়,
ময়দানে খেলা ভাঙলে
সন্ধে।

যেতে যেতে
দুপাশের দেয়ালে আল্‌সেয় ছাদে
লটকানো
আকাশের রকম রকম ছিট
রকম রকম ছাঁট।

ঢেউ-খেলানো টিনের গায়
চিড়বিড়িয়ে শিল পড়লে
এখনও
কী যে মজা হয়।

টেবিলে, জুতোর বাক্সে
উত্তরের অপেক্ষায়
চিঠির ডাঁই।
না লেখার অপরাধ
দু-একটা দীর্ঘশ্বাসে হালকা হওয়ার নয়।

মাছ ধরার জাদু দেখাত
যে হাত-কাটা লোকটা—

বর্ষার এ মরশুমেও,
মনে রেখো,
তাকে দেখা গেল না।

রাস্তার গর্তগুলো
ছোট থেকে বড় করতে করতে
এগিয়ে চলেছে সময়॥

২

বাড়িতে পায়েস হলে
জানতে পারি
আমারও একটা জন্মদিন আছে।

মাঝরাত্রে ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ শুনে
ধরতে পারি
পৃথিবীতে নতুন মানুষ এল।

আমার একটুও ভালো লাগে না
তবু শবানুগমনে
মাঝে মাঝে আমাকে যেতেই হয়—
নেহাত মুখরক্ষার জন্যে।

চেনা লোকদের টেনে নিয়ে গিয়ে
চায়ের দোকানে তুলি।
চায়ে চুমুক দিতে দিতে দেখি
বরের গাড়ি
ফুল সাজিয়ে চলে যাচ্ছে।

যাক,
যা বলছিলাম—
কী যেন বলছিলাম
ভুলে গিয়েছি।
কাল হঠাৎ মনে পড়ে যাবে
এক-বাস্ লোকের মধ্যে।
হুঁশ হলে দেখব
আমার নামবার স্টপ
কখন পেছনে ফেলে এসেছি॥

৩

গল্পটা অনেকক্ষণ থেকেই
বলব বলব করছি।

রড-ধরা একটা হাতে
একটা ঘড়ি
আমার চোখের সামনে
কেউ পরছিল কিংবা খুলছিল।

নামব ব'লে হাত টেনে নিতে গিয়ে
হঠাৎ ঠাহর হল
হাতটা আমার
এবং ঘড়িটা অদৃশ্য।

পাদানি থেকে ঘড়িটা উদ্ধার হল
সেইসঙ্গে
পেছনে সিন্ খাটিয়ে তোলা
একটা মেয়ের ছবি।

ঘড়িটা গেলে
আমি সময়ের হাত থেকে
বাঁচতাম।
ছবিটা পেলাম একেবারেই উপ্‌রি।

কেননা পকেট থেকে ঘড়িটা
ফেলে দিতে গিয়ে
ভুল ক'রে ছবিটাও সেইসঙ্গে পড়ে গিয়েছিল ব'লে—
ছবির কোনো মালিক পাওয়া গেল না।

এখন আমার কাজ বেড়েছে।
ন'টার ভোঁ-র সঙ্গে
                    ঘড়িটা
আর মেয়েদের মুখের সঙ্গে
                    ছবিটা
মেলাতে গিয়ে সময়ের জালে
যেন আরও বেশি জড়িয়ে পড়ছি॥

ফেরাই

(দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী-কে)

সবাই সমান

যেখানে গেলে সবাই সমান হয়

'সব লাল হো যায়েগা' ব'লে
এক লাফে
সটান সেই জায়গায়

কাঁধ ধরাধরি ক'রে
পৌঁছুনো
এবং পৌঁছে দেওয়া গেল

রাবণের চুল্লির সামনে লাইনবন্দী হয়ে
ধর্না দিচ্ছে
লালগাড়ি-পাশ-হওয়া
ছুরিবিদ্ধ গুলিবিদ্ধ
অপাপবিদ্ধের দল

নিশির ডাকে নিশান হাতে
যারা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিল
তারা এখন
সাড়ে তিন হাত জমির দখল ছেড়ে
আগুনের মুখে ছাই হওয়ার অপেক্ষায়

চোখ বন্ধ ব'লে
ওরা দেখতে পাচ্ছে না

মেঝে থেকে দেয়াল, দেয়াল থেকে ছাদ
শোয়ানো আর দাঁড়-করানো অক্ষরে
অঙ্গার দিয়ে লেখা অঙ্গীকার

ভুলব-না ভুলব-না ভুলব-না!

একটা ক'রে যায়
লাইন একটু ক'রে এগোয়।।

বলির বাজনা

রাত্রে রেডিওতে যখন খবর বলে
কানে আঙুল দিয়ে থাকি
সকালে কাগজ এলে
ছুঁতেও ভয় করে

লাইনবন্দী চেনা মুখগুলো
একের পর এক
একের পব এক ভেসে ওঠে

আমার পুরোনো সব বন্ধুর ছেলেরা
ছিল আমার নতুন বন্ধু
সিগারেট আমিই এগিয়ে দিতাম
যাতে তারা ছলছুতোয়
আমাকে একা ফেলে উঠে যেতে না পারে

ছেলেধরার দল
নাকের কাছে ফুল শুঁকিয়ে
ফুস্‌লে নিয়ে চলে গেছে
তাদেব বলি দেবে ব'লে

এখন যারা কবিতা শোনাতে আসে
তাদের কবিতা আমি শুনতে চাই না
যারটা শুনতে চাই
কলম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
এখন সে শবসাধনায় উধাও

লালবাড়ির ভেতর থেকে আসছে
হায়নাদের হাড়ভাঙার শব্দ
ঘুমের মধ্যে আমি চমকে চমকে উঠছি
কালো গাড়িগুলো থেকে
ঘষে ঘষে তোলা হচ্ছে চাপ চাপ রক্ত
হরিণবাড়িতে পাগলাঘণ্টি
বেজে চলেছে বেজে চলেছে বেজে চলেছে

একদল বাইরে থেকে ওসকাচ্ছে

একদল ভেতর থেকে ভাঙছে
বলির বাজনায় আর জয়জোকারে
রক্তমাখা খাঁড়াগুলো

উঠছে আর পড়ছে
উঠছে আর পড়ছে॥

মধ্যিখানে চর

মধ্যিখানে চর

এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন
এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন
ভাঙছে আর ভাঙছে

বলেছিল কবর দিতে
যারা খুঁড়ছিল
সেই কবরেই পেছন থেকে তাদের ঠেলে দেওয়া হল

বলেছিল দেশ বরবাদ
পরে দুনিয়াটাকেই ছেঁটে ফেলে দিল

ধরা পড়বার ভয়ে
সারা রাস্তা 'চোর চোর' করে ছোটার পর
সিন্দুকের লাখবেলাখে
গোয়েন্দা-সিরিজে ফাঁস হয়ে যায়
হাতসাফাইয়ের কলকাঠি

গড়বার দল নয়
একটা ভাঙবার চক্র
নামাবলী গায়ে দিয়ে ভক্তদের ভোলাচ্ছে

মধ্যিখানে চর
তার আড়ালে ব'সে রয়েছে
কোন্ সে সওদাগর?

বন্ধুরা কোথায়

কাঁধের গামছাগুলো হাতে নিয়ে
একটা দল
গুম হয়ে ব'সে

পথ
এখন এক অন্ধগলিতে এসে ঠেকে গেছে
শহিদের স্মৃতি রাখতে শহিদ হওয়া
খুনের বদলে খুন
এই বৃত্তটাকে কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না

যারা মৃত্যুর সওদাগর
পাখি-পড়ার মতো ক'রে তারা বোঝাচ্ছে
হয় মারো নয় মরো
এগোবার পথ তারাই প্রশস্ত করেছিল
এখন ফেরবার পথে
তারাই কাঁটা দিচ্ছে

আমার সেই বন্ধুরা কোথায়
আমি জানি না
পাছে কোনো অকল্যাণ হয়
তাই কাউকে জিজ্ঞেস করি না
দেখে ফেললে না-চেনার ভান করি

যারা শত্রুকে একঘরে না ক'রে
বন্ধুকে শত্রু করছে
যারা সংগ্রামের সাথীদের
আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়ে
মৃত্যুর গুণগান গাইছে—

সেই শয়তান চক্রটাকে এবার
যেখানে পাও খুঁজে বার করো
ফাঁক ভরাট করো
ভাঙাকে জোড়া দাও
তাহলেই সোনার কৌটোয় কালো প্রাণভোমরাগুলো
বুক ফেটে দাপিয়ে দাপিয়ে মরে যাবে

কাঁধের গামছা কোমরে বেঁধে
শ্মশান থেকে উঠে এসো
ভালোবাসায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে
জীবনটাকে ধরো

যৌবনের ফেরাই দিয়ে,
হারিয়ে-যাওয়া নতুন বন্ধুরা আমার,
সমানে জিতে নাও সৃষ্টির পিঠ

যাবার আগে যেন দেখে যাই
মেঘভাঙা রামধনু

ঢেলে সাজা পৃথিবীর বুকে
যেন শুনতে পাই
ভোরবেলার আজান॥

একুশে ফেব্রুয়ারি

বাক্সটার মধ্যে রাজ্যের জিনিস তালাবন্ধ—
চাবিটা
আমি সারা ঘর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছি।
ছোট্ট মেয়েটা হঠাৎ
আমার মুঠোটা খুলে দিয়ে বলল,
এই তো!
এতক্ষণ তো তোমার হাতের মধ্যেই ছিল!

দ্রুতি

গভীর রাত
তীব্র গতি
খড়ের গাড়ি
গরুর চোখ
গাছের গুঁড়ি
খড়ির দাগ॥

শব্দে আর নিঃশব্দে

দেয়ালের মধ্যে দেয়াল।
নখের মধ্যে ছুঁচ।
ঘুমের মধ্যে জেরা।
শয়তানের দল জানে—
বোমার শব্দে সব চাপা পড়ে যাচ্ছে।

রক্তের মধ্যে রক্তবীজ।
চোখের মধ্যে স্বপ্ন।
বুকের মধ্যে বিশ্বাস।
শয়তানের দল জানে না—
নিঃশব্দে সমস্ত কিছু ফাঁস হ'য়ে যাচ্ছে॥

আজকের গান

ডাকে বান,
            ভাঙে বাঁধ—
                        হাতে দাও হাত, ভাই
                                    হাতে দাও হাত।

দলে দলে কাঁধে কাঁধ
            চলো একসাথ, ভাই
                        চলো একসাথ।
ছলেবলেকৌশলে
সমানে লোভের হাত কে বাড়াস?
সম্মুখে
            পথ রুখে
                        কে দাঁড়াস?

শয়তান,
সাবধান!

ডাকে বান,
            ভাঙে বাঁধ—
                        হাতে দাও হাত, ভাই।

দলে দলে কাঁধে কাঁধ
চলো একসাথ, ভাই।

যে আজো পিছিয়ে আছে
তাকে ডেকে আনো কাছে
যে রয়েছে নীচে প'ড়ে
তুলে আনো হাত ধ'রে।

আনো দিন হাতুড়ির
আনো দিন কাস্তের
খাদ্যের শিল্পের শিক্ষার স্বাস্থ্যের।
নতুন দিনের আলো লেগে করে ঝলমল ঝলমল

বঞ্চিতদের সাধআহ্লাদ।
আমাদের লাখো লাখো পদভরে টলমল টলমল
নড়ে ওঠে বনিয়াদ।
পার হতে বাকি শেষ লড়াইয়ের ময়দান
দুর্দমনীয় বেগে চলো হই আগুয়ান।

ডাকে বান,
ভাঙে বাঁধ—
হাতে দাও হাত ভাই।
দলে দলে কাঁধে কাঁধ
চলো একসাথ ভাই॥

আলোয় অনালোয়

দিনের আলো নিবে যাবার পর
ঘরের মধ্যে আলোগুলো জ্বলে উঠল।
কোণাঘুপ্‌চিতে গা-ঢাকা দেওয়া অন্ধকার
আমাদের কারো পাশে
কারো পেছনে
উঠে এসে গা ছুঁয়ে দাঁড়াল।

আলো-অন্ধকারের এই ইতরবিশেষ
আমরা আদৌ গায়ে মাখি নি।

এমন সময়
গনগনে লোহার গায়ে জল লাগার মতো
পাড়া জুড়ে এক আচম্বিত শব্দে
সমস্ত আলো একেবারে ফস ক'রে নিবে গেল।

অন্ধকারে আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না।
একজন উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরের দরজাটা
বন্ধ ক'রে দিয়ে এল।
টর্চ জ্বালিয়ে খানিকক্ষণ এর ওর মুখের ওপর ফেলা হল,
দেখা গেল প্রত্যেকেই উসখুস উসখুস করছে।
 আলোয় আমরা পৃথক পৃথক থেকেও
কেমন মিলেমিশে এক হয়ে ছিলাম ;
অন্ধকার আমাদের একাকার ক'রে
পরস্পরের কাছছাড়া ক'রে দিল।

ঘরজোড়া স্তব্ধতায় শোনা গেল
ইতিহাসের এক ভীষণ চিলচিৎকার॥

কড়াপাক

ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল মহাপাজি
গাজী
আর খাইবার
তার জুড়িদার
এ কালাপানির দুই কালসাপ
বিলকুল সাফ।

আকাশে ভোঁ-কাটা, মাটিতে সাবাড়
স্যাবার

রাস্তায় খান্ খান্ কে
গড়াগড়ি যায় ট্যাঙ্কে।

ঠ্যাঙানির চোটে
ফেলে পল্টন আগেভাগে ছোটে

পশ্চিমা বীর মিঞাজি
নিয়াজি।

চীন-মার্কিন টের পাক।
এ কঠিন ঠাঁই—কড়াপাক॥

পুবহাওয়ার গান

হাওয়া দিচ্ছে হাওয়া
স্রোত বইছে স্রোত
এপার থেকে ওপার
ভেসে যাচ্ছে ফুল।
যা রে ফুল পুবে যা
আঁধারে ডুবে ডুবে যা—
আমার ফুল লাল টুকটুক
নাচতে নাচতে যায়
আমার ফুল ডাঙায় ওঠে
যেখানে মাটি রক্তে ভেজা।
যা রে ফুল পুবে যা
আঁধারে ডুবে ডুবে যা—
গুণবতী ভাই আমার,
মন কেমন করে
কবে দেখা হবে ও ভাই,
কবে আসবে ঘরে।
যা রে ফুল পুবে যা
আঁধারে ডুবে ডুবে যা—
এই ফুল লাল টুকটুক
ভাইয়ের পুব আকাশে ফুটুক
রুজু রুজু খেলুক হাওয়া
খুলে দাও জানলাদরজা।
যা রে ফুল পুবে যা
আঁধারে ডুবে ডুবে যা॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

5/B, Sarat Banerjee Road
Calcutta-700 029
Telephone : 42 2384

স্নেহের সুধীর,

তোমার চিঠি।

(১) ১৯৫৭-র বিন্যাসই বহাল রেখো। আগের সংস্করণে কেন ও-রকম করা হয়েছিল মনে নেই। হয়তো বেশি জায়গা নেবার জন্যে কি? নাকি পাঠকদের পড়ার সুবিধের জন্যে?

অবশ্য আমার সন্দেহ;

'হুঁইক! হুঁইক! যেখানেই থাকি, সংসারে হলে সকলে সঙ্গিরা থাকবে'

অর্থাৎ, টানা হবে লাইনে।

এখন তোমার যেটা ইচ্ছে।

(২) 'উত্তর বন্যার শুধু ঝাঁপে .....'

অবশ্যই 'ঝাঁপে'।

ভালোবাসা জেনো।

সুভাষদা

১০/১২/৯১

নিয়ে যাব শহর দেখাতে

১

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

ক্যাম্পে ট্রেনিং শেষ
তার হাতে
মাত্র চার প্রহর সময়।
নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

চোখের ওপর আর নয়
গাল বেয়ে
নেমে এসে বুকের পাঁজরে
হাত দাও, কান রেখে শোনো
দেখ চেয়ে—
অগ্নিগর্ভ কালের গহ্বরে
স্পন্দমান
দেশ।
নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

যা ছিল না স্পষ্ট কখনও
শুধু ভাসা-ভাসা
যার স্থান
সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে
ভেঙে গিয়ে সে ?
জল হয় যদি—
ফলন্ত ফুলন্ত হয় মাটি,
মুক্তিযুদ্ধে
শিরায়

দ্র. কবিতা ২ : ১৮

১ দিন আসবে

নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভ অনুবাদ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। মুদ্রকপত্রের হুবহু বিবরণ নীচে দেওয়া হ'লো ঃ

॥ বাংলা অনুবাদ॥
প্রকাশকাল জুলাই ১৯৬১
॥ প্রচ্ছদ এঁকেছেন॥
শ্রীরেবতী ঘোষ
॥ সহায়তা করেছেন॥
শ্রীরথীন মিত্র
॥ ছাপিয়েছেন ও বাঁধিয়েছেন॥
শ্রীবাণী প্রেস
১২৮, হাজরা রোড
কলিকাতা-২৬

॥ প্রকাশক॥
নির্মল বোস্ এণ্টারপ্রাইজ
১৩, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১

মূল্য — আড়াই টাকা

'দিন আসবে'-র প্রথম সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য। নয়া দিল্লির বুলগারী প্রজাতন্ত্র দূতাবাসের কাউন্সেলর ডি. গোরানেভের সৌজন্যে বইটির আখ্যাপত্র, মুদ্রকপত্র, এবং ভূমিকার জেরক্স কপি পেয়েছি। এই সংস্করণে ভূমিকারূপে 'অনুবাদ প্রসঙ্গে' যেভাবে ছাপা হয়েছে তা পরবর্তীকালের পাঠ থেকে আলাদা। নীচে প্রথম পাঠটি মুদ্রিত হ'লো :

অনুবাদ প্রসঙ্গে

গোড়াতেই কবুল করা ভাল, এ অনুবাদ সরাসরি মূল থেকে নয়। বুলগারীয় ভাষা থেকে ইংরেজি, তারপর সেই ইংরেজি থেকে বাংলা। অনুবাদে এই ঘুরপথের আশ্রয় না নিয়ে আমার উপায় ছিল না। কারণ, বুলগারীয় ভাষা আমার জানা নেই। ফলে, মূল থেকে কতটা সরেছি তা জানাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলতে পারি, যথাসম্ভব ইংরেজি অনুবাদের পায়ে পায়ে চলবার চেষ্টা করেছি।

নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভের কিছু কিছু কবিতা মূল বুলগারীয় ভাষায় আমাকে একবার একজন পড়ে শুনিয়েছিলেন। ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে আমার মনে হয়েছিল এমন কি ইংরেজিতেও মূল কবিতার ছন্দ ও মিল সব ক্ষেত্রে বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। কাজেই সে চেষ্টা না ক'রে দু একটি ছাড়া সব অনুবাদেই আমি সোজাসুজি গদ্যের আশ্রয় নিয়েছি।

বাংলায় ভাপ্‌ৎসারভের কবিতার অনুবাদ এই প্রথম নয়। যাঁরা ইতিপূর্বে ভাপ্‌ৎসারভের কবিতার অনুবাদ ক'রে বাঙালী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ। এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে, যখন সটান বুলগারীয় ভাষা থেকে ভাপৎসারভের কবিতা বাংলায় অনুবাদ হবে। তখন আর দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর কোন দরকার হবে না।

এই সংকলনের একটি কবিতার নামেই এই গ্রন্থের নাম রাখা হল। এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত কবিতার সাজাই বাছাই সম্পর্কেও অনুবাদকের পক্ষ থেকে দু-একটি কথা বলা দরকার।

বাংলায় সহজে আসে, প্রধানত এমন কবিতাই এ সংকলনের জন্যে বাছাই হয়েছে। তা সত্ত্বেও জায়গার টানাটানির দরুন কিছু ভাল কবিতা বাদ দিতে হল। পরের সংস্করণে সে ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা যাবে।

কবিতাগুলি কালক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়নি। যেমন ফাঁসীতে যাবার আগে লেখা দুটি কবিতার একটি এ সংকলনের একেবারে গোড়ায় ও আর একটি একেবারে শেষে দেওয়া হয়েছে। কবিতাগুলি সাজানো হয়েছে বিষয় ও রসের বৈচিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে। কোন্ কবিতা কবে লেখা, প্রত্যেকটি কবিতা পড়লেই মোটামুটি তা আঁচ করা যাবে।

ভাষার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এ অনুবাদ যদি বাঙালী পাঠকের মনে প্রতিধ্বনি জাগায় তাহলেই অনুবাদকের শ্রম সার্থক হবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

—প্রথম (বি) সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৭৬। দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১। প্রকাশক ব্রজকিশোর মণ্ডল। বিশ্ববাণী প্রকাশনী ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯। মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়। লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস ৬ নং শিবু বিশ্বাস লেন কলিকাতা-৬। দাম চার টাকা। ভূমিকাসহ পৃষ্ঠা ৪৯। মোট ১৪টি কবিতার অনুবাদ :

১	যাবার আগে	৮	গর্কী
২	কারখানা	৯	স্পেন
৩	ছবিঘর	১০	দ্বৈরথ
৪	বাড়ি তুলব	১১	দিন আসবে
৫	একটি চিঠি	১২	স্মৃতি
৬	গ্রামবার্তা	১৩	রোমান্স
৭	মানব-বন্দনা	১৪	শেষ কথা

এই বইটি পরে বিশ্ববাণী প্রকাশনীর 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ'র দ্বিতীয় খণ্ডের (১৩৮১) অন্তর্ভূত।

'দিন আসবে' প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার সিকদারের অভিমত :

ইমেজের পর ইমেজ সাজিয়ে পুরো কবিতার সংগঠনের ব্যাপারে হিকমতের কবিতার তর্জমার সঙ্গে 'ফুল ফুটুক' কবিতাগুচ্ছের বেশ মিল পাওয়া যায়। দুটো কবিতার বাচনভঙ্গির মিল কতোটা হতে পারে তার প্রমাণ মিলবে—'তুমি আমি' (হিকমত) এবং 'পারাপার' (ফুল ফুটুক) কবিতা দুটো পরপর পড়লে। এই সব থেকে তাই মনে হয়, নিজের স্বরে নিজের গান গাইবার আগে পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নাজিম হিকমতের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে স্বরচর্চা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু হিকমতের তর্জমার যে তাৎপর্য সুভাষের বিবর্তনে, সেই তাৎপর্য উত্তরকালে প্রকাশিত বুলগার কবি নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভের তর্জমা 'দিন আসবে' বইয়ে নেই। হিকমতের তর্জমা সুভাষের পরবর্তী মৌলিক রচনাকে প্রভাবিত করেছে, সেই

রকম কোনো প্রভাব 'দিন আসবে' কবিতাগুচ্ছের নেই। 'আমার বুকের বর্মে ঢাকা/বিশ্বাস আমার/সেই বিশ্বাস ভাঙবে/তেমন বুলেট/ত্রিভুবনে নেই' (দিন আসবে)। এই সব অংশ যখন পড়ি তখন এটাই স্পষ্ট হয় যে এই তর্জমা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব রীতির দ্বারাই বরং প্রভাবিত।

('আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়', কলকাতা, ১৩৮১ পৃ ২৬৪)

২ যত দূরেই যাই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৬৯। প্রকাশক কানাইলাল সরকার। ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২। মুদ্রাকর সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য। তাপসী প্রেস ৩০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬। প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী। ব্লক মুদ্রণ ইণ্ডিয়ান ফটো এনগ্রেভিং। বাঁধাই তৈফুর আলী মিএগা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স। দাম তিন টাকা। উৎসর্গ বন্ধু অশোক ঘোষ-কে। রচনাকাল ১৯৫৭-১৯৬০। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৭। আটাশটি কবিতার সংকলন :

১. যেতে যেতে (তারপর যে-তে যে-তে যে-তে)
২. পায়ে পায়ে (সারাক্ষণ সে আমার পায়ে পায়ে)
৩. দিনান্তে (পশ্চিমের আকাশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে)
৪. পোড়া শহরে (তেলচিটে সবুজ ঘাস)
৫. পাথরের ফুল (ফুলগুলো সরিয়ে নাও)
৬. যেন না দেখি (যেখানে আকাশের)
৭. লোকটা জানলই না (বাঁদিকের বুক-পকেটটা)
৮. যত দূরেই যাই (আমি যত দূরেই যাই)
৯. ফিরে ফিরে (সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে)
১০. কে জাগে (সেই কোন সকালে)
১১. আরও গভীরে (মাথার ওপর গোল কালো পাথরটায়)
১২. ঘোড়ার চাল (মারা অত সহজ নয়)
১৩. গণনা (আমাকে একটা ফুলের নাম বলো)
১৪. রাস্তার লোক (চোখ পড়তেই)
১৫. কেন এল না (সারাটা দিন ছেলেটা)
১৬. বারুদের মত (আকাশে রক্তচক্ষু)
১৭. বোকা (ওহে খোকা! বসে পড়ো)
১৮. রংরুট (হেরেছি? তাতে কী?)
১৯. এখন যাব না (বাতাসের কান আছে দেখছি)
২০. ছাপ (কেউ দেয়নি কো উলু)
২১. আলো থেকে অন্ধকারে (এ শহরে)

২২. পা রাখার জায়গা (পৃথিবীটা যেন রাস্তার)
২৩. মেজাজ (থলির ভেতর হাত ঢেকে)
২৪. ফলশ্রুতি (ফলের দোকানের সামনে)
২৫. ছেই (ভাজা ইলিশের গন্ধে)
২৬. দূর থেকে দেখা (আমি আমার ভাবনাগুলোকে)
২৭. এই পথ (চোখে চোখ পড়তে)
২৮. মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ (আরে! মুখুজ্জে মশাই যে)

'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থের জন্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এই প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় (সংখ্যা ২০ বিংশ সংকলন ১৯৬৫) লেখা হয় :

আকাদেমি পুরস্কার

এ বৎসর আকাদেমি পুরস্কার বাংলায় দেওয়া হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। আমরা এজন্য অতীব খুশি হয়েছি। কবি হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, বাংলা কবিতায় তাঁর আগমন অবধারিতের মতো, সুতরাং ঐ পুরস্কারের উল্লেখে আমাদের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পুরস্কারের সঙ্গে আছে বিপুল অপচয়যোগ্য অর্থরাশি। ঐ অর্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিশ্চিত খুব প্রয়োজন ছিল।

আগামীবারের জন্য, বিচারকদের যাতে ভুল না হয়, আমরা মনে করিয়ে দিচ্ছি— যেন অবশ্য কমলকুমার মজুমদারকে দেওয়া হয় ঐ পুরস্কার ও অর্থ। তাঁরও নিশ্চিত প্রয়োজন। এবং বাংলাদেশে, সাহিত্যের জন্য ইহজীবনে এতখানি আত্মত্যাগ কমলকুমার মজুমদারের মতো কে করছেন আর।

ত্রিবেণী থেকে 'যত দূরে যাই'-এর আরো দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে মাঘ ১৩৭১ এবং জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ বঙ্গাব্দে। ভারবি সংস্করণের মুদ্রকপত্রে 'সংস্করণ' বলা হ'লেও এগুলি পুনর্মুদ্রণ মাত্র।

—ভারবি সংস্করণও মূলত তাই। 'পাপড়ি' বদলে 'পাঁপড়ি' ('গণনা'), 'দেখ' বদলে 'দেখো' ('রাস্তার লোক'), 'শাশুড়ী বদলে' 'শাশুড়ি' ('মেজাজ'), 'ভূশণ্ডি' বদলে 'ভূশুণ্ডি' (ঐ), 'বাহবা' বদলে 'বাহাবা' ('ছেই') হওয়া ছাড়া এবং বিরতি চিহ্নের ঈষৎ রদবদল ছাড়া কোনো পরিবর্তন নেই। অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য হ'লো ঃ

আগেকার মুদ্রণগুলির উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে ঃ

প্রথম ভারবি সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৭৫, জুলাই ১৯৬৮ প্রকাশক গোপীমোহন সিংহ-রায়, ভারবি, ২৬ কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। মুদ্রক : শ্রী নারায়ণ লাহিড়ী, লয়াল আর্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ১৩ দাম ঃ সাড়ে তিন টাকা।

কবিতাগুলি অপরিবর্তিত, তবে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৬। এই সংস্করণেরও প্রচ্ছদ শিল্পী

পূর্ণেন্দু পত্রী। তবে আমার দেখা কপিতে প্রচ্ছদ ছিলো না ব'লে পুরনো কভারটিই ব্যবহৃত হয়েছে কিনা নিশ্চিত নই। এটি পরে 'বিশ্ববাণী'-র 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় কাব্যসংগ্রহ'-র (১৩৭৯) অন্তর্ভূত।

—দে'জ সংস্করণে (১৯৯২) কোনো পরিবর্তন নেই।

পুরস্কার প্রাপ্তি ছাড়াও 'যত দূরেই যাই লেখক পাঠকমহলে নানারকম প্রতিক্রিয়ার সূচনা করেছিল। প্রসঙ্গত সমীর রায় সম্পাদিত 'মহেঞ্জোদারো' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যায় (কার্তিক-চৈত্র ১৩৬৯) প্রকাশিত অনিমেষ পালের দীর্ঘ সমালোচনা এবং তদুত্তরে দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যায় (বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৭০) সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো :

কবি হিসাবে শ্রীযুক্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুপরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত। নানা পত্র-পত্রিকায় কাব্য-সঙ্কলনে তাঁর কবিতা এতদিন মুগ্ধ বিস্ময়ে পড়ে এসেছি। তাঁর কাছে আজো আমাদের অনেক প্রত্যাশা। আর এতদিন পরে সে প্রত্যাশা যে যথার্থই সার্থক হয়েছে সে কথা বলবার জন্যই এ লেখা!

বিনা দ্বিধায় বলি—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যের সার্থকতম সৃষ্টিগুলির মধ্যে, 'যত দূরেই যাই'—অন্যতম। বইটিতে কবিতা আছে আটাশটি। রচনাকাল ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০। বইয়ের শেষ কবিতা 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ' আকারে দীর্ঘতম, প্রকারে স্পষ্টই রাজনৈতিক কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি সুগভীর আস্থায় মহৎ। মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ'-এর ভাষার মধ্যে তুলনীয় সাম্প্রতিক কোন কবিতা পেলুম না। তুর্কী কবি নাজিম হিকমতের কবিতার গঠন ভঙ্গীর সঙ্গে কবিতাটির গঠন ভঙ্গীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় হিকমতের কবিতার বঙ্গানুবাদ করেছিলেন বলেই অবশ্য কথাটা মনে পড়ল। এই আশ্চর্য কবিতাটি নিয়েই আলোচনা করা প্রয়োজন, কেননা এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি যে বিশিষ্ট দেশকালের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে সেই দেশকাল সম্বন্ধে এই কবিতাটিতেই কবি তাঁর মনোভাবটিকে ঋজুতম ভাষায় ঘনপিনদ্ধ ছন্দে প্রকাশ করেছেন।

'আরে। মুখুজ্যে মশাই যে! নমস্কার, কী খবর?/ আর এই লেখা-টেখা সংসার-টংসার এই নিয়েই ব্যস্ত/'—আরম্ভ হলো কবিতাটি নিতান্ত আটপৌরে গদ্যে, আলাপচারীর ভঙ্গীতে। কেউ একজন মুখুজ্যেকে বলছেন কয়েকটি কথা চায়ের দোকানে ডেকে নিয়ে গিয়ে—'তার চেয়ে এসো, চেয়ারটা টেনে নিয়ে/ জানলায় পা তুলে বসি।/ এক কাপ চায়ে আর কতটা সময়ই বা যাবে?—'/ কিন্তু গদ্য তার বাহুল্য ঘুচিয়ে পরক্ষণেই ব্যঞ্জনাগর্ভ সংহতি লাভ করল—/ 'আকাশে গুড় গুড় করছে মেঘ—/ ঢালবে/ কিন্তু খুব ভয়ের কিছু নেই,/ যুদ্ধ না হওয়ার দিকে।'/—এরপর বক্তার কণ্ঠে প্রফেটের স্বর শোনা গেল—/ 'ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টির, অন্ধকারের চেয়ে আলোর দিকেই/ পাল্লা ভারী হচ্ছে।/ ঘৃণার হাত মুচড়ে দিচ্ছে ভালবাসা।'/ 'এবং/ পৃথিবীকে নতুন করে সাজাতে সাজাতে/ ভবিষ্যৎ কথা বলছে শোনো,/ ক্রুশ্চেভের গলায়।'/

এই রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে অনেকেরই একমত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ভাষার

এই আশ্চর্য্য সংহতরূপ এবং শাণিত বাক্‌ভঙ্গীমা কাব্যদেহে যে অভিনব ঔজ্জ্বল্য এনেছে সে সম্বন্ধে দ্বিমত হবেন না বোধহয়।...

+

এবং কাব্যগ্রন্থটির সবকটি উজ্জ্বলতম দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই প্রথম প্রয়োজন। এই কাব্যের আরেকটি অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা তার চিত্রকল্প বা image রচনায়। কবির সৌন্দর্য্য দৃষ্টি এবং জীবন দৃষ্টির যুগ্ম প্রকাশেই image গুলির অসাধারণত্ব। নিতান্ত জড়বস্তু কিংবা প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে কবি ইন্দ্রিয়ঘন অনুভূতি এবং সামাজিক-রাজনৈতিক তির্য্যকতা আরোপ ক'রে যে শৈল্পিক দক্ষতা দেখিয়েছেন তার তুলনা প্রাক্ মহাযুদ্ধ বা মহাযুদ্ধোত্তর কোন কালের বাংলা কবিতায়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না। বইটিতে একাধিক এমন কবিতা আছে যাকে বলা যায় এইরকম চিত্রকল্পের মালা। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক,—'পশ্চিমের আকাশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে/ যেন কোন দুর্ধর্ষ ডাকাতের মত/ রাস্তার মানুষদের চোখ রাঙাতে রাঙাতে/ নিজের ডেরায় ফিরে গেল/ সূর্য্য/ তার অনেকক্ষণ পরে/ সরেজমিন তদন্তে/ দিনকে রাত করতে/ যেন পুলিশের/ কালো গাড়িতে এল/ সন্ধ্যা।/ আলোটা জ্বালতেই/ জানালা দিয়ে বাইরে/ লাফিয়ে পড়ল/ অন্ধকার।/ পর্দাটা সরাতেই/ ভয়চকিত হরিণীর মত/ আমাকে জড়িয়ে ধরল/ হাওয়া।'—(দিনান্তে।)

+

আর উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। চিত্রগুলি সবই শহর এবং শহরতলীর কলকাতার।

'যতদূরেই যাই' এ গ্রামীণ চিত্র নেই বললেই চলে। গ্রাম বাংলার জন্য আছে একটি রোম্যান্টিক বেদনা।

+

পরিশেষে সহৃদয় কাব্য পাঠকের কাছে নিবেদন---বইটি পড়ুন। কেননা ম্যাক্‌কার্থী ও গোয়েব্‌লসের প্রেতাত্মারা আজ সদলে বাংলা সাহিত্যের স্কন্ধে চেপে বসবার মতলব আঁটছে। আজ একথা প্রমাণ করার সময় এসেছে যে প্রচার—বিচার নয় এবং বাঙ্গালী পাঠকের রসোপভোগের ক্ষমতা ও তাঁদের মন পত্রিকা বিশেষের কাছে বন্ধক দেওয়া নেই।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এই সমালোচনার জবাব দেন :

আজ ভোরবেলা দাঁত মাজতে মাজতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে যা যা মনে পড়ল সংক্ষেপ না করে, সম্পাদক মহাশয় আপনাকে নিচে জানাচ্ছি।

১। সুররিয়ালিজম, দাদাইজম, ইম্প্রেসনইজম, অমুক তমুক ইত্যাদির স্তর পার হয়ে কবিতা এখন ঘরে ফিরে এসেছে। যেকোনো ধরনের রিয়াল-ইজমই একে বলতে হবে, মলয় বলছেন হাংগরিয়ালিজম, আসলে ট্রু-ইজম। স্ট্রেটফরোআর্ড কবিতাই সর্বত্র লেখা হচ্ছে, আধুনিকতা বলতে আপাতত অন্য কিছু বোঝায় না। ইমেজ তো দূরের কথা সিম্বল কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। বাঁচার মানে মানুষ আর খোঁজে না। বাঁচার কোনো মানে নেই একথা ওয়ান্স-ফর অল জানতে পারা গেছে। মানুষের আগে আজ আর কোনো বিশেষণ বসানো হয় না।

২। সুভাষ মুখোপাধ্যায় একজন 'ইমেজিস্ট' কবি, 'চিত্তচমৎকুমারী' তাঁর ছন্দ, বেশ,

তাঁর কবিতার সঙ্গে তুলনীয় সাম্প্রতিক কোন কবিতা সমালোচক পান না। ধরা যাক এ বিষয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'শ্রেষ্ঠ', কিন্তু কি ক'রে শ্রেষ্ঠ, কারণ কে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী? কিছু সাবালিকা রমণী ও য়ুনিভার্সিটির ছেলেপিলেদের মধ্যে ছাড়া ছন্দ, ইমেজ এ-সবের রেওয়াজ যে একদম উঠে গেছে! সামলোচক (sic) তবে কি সত্যিই মনে করেন যে, তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এখনো মৃত সত্যেন দত্তদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, মানে আমি বলছি, ছন্দের কারবারে? ইমেজ-এর ব্যাপারেও কেউ তাঁকে ডুয়েল লড়তে আহ্বান করবে না, অন্তত এ-জেনারেশনে কোন কবি, অবশ্য ডুয়েল লড়ার যুগও আর নেই। আমাদের জীবদ্দশাতেই শিল্প-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ হয়ে গেল। গদ্য কবিতা? সকলেই জানেন বাঙলা গদ্য ছন্দের পাইওনিঅর হলেন সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় নন। তিনি ছাড়া সিদ্ধেশ্বর সেন গদ্যকবিতার অন্যতম কবি। মাত্রাবৃত্ত ইত্যাদি উঠে যাবার পর এখন থেকে শুধু পয়ারহীন টানা গদ্যই চলতে থাকবে।

জীবনানন্দ দাশের গ্রেটনেস ৬০-দশকে আমরা বুঝেছি। বস্তুত জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ছাড়া সমস্ত রবীন্দ্রনাথ-সমেত সমগ্র বাঙলা সাহিত্য আর ঐ দুই লেখকের পৃষ্ঠপোষকতা করার দিক থেকেই সিগনিফিক্যান্ট—এ ছাড়া আর কার কি বলার থাকতে পারে? একদা বুদ্ধদেব বসু সুভাষের প্রশংসা করেছিলেন, ৩০-এর কালে সেটা তেমন বোকামোও হয়নি, কিন্তু সমালোচক মহাশয় এই ৬২-৬৩ সালে কেন হঠাৎ? 'মুগ্ধ' হয়েছেন, 'বিস্মৃত' হয়েছেন, তাঁকে 'বিষণ্ণ' করে তুলেছে এ-সবই সত্যি—কিন্তু 'সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন,' 'কেউ দ্বিমত হবেন না বোধহয়'—এ-সব আশা তিনি কি করে করেছেন? 'কয়েকটি কবিতায় বাৎসল্যের মধুর স্পর্শ অনায়াসলভ্য'? 'পরিশেষে' সমালোচক মহাশয় যা লিখেছেন তা অত্যন্ত বিশ্রী। আমি তাঁকে বলছি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে তাঁর পরিশিষ্টটুকু অত্যন্ত অপমানজনক। আমি অপমানিত বোধ করেছি। 'সহৃদয় কাব্যপাঠকের কাছে নিবেদন বইটি পড়ুন!' মাজন বিক্রী করছেন নাকি সমালোচক মহাশয়? দাঁত মাজতে মাজতে, আজ সকালে, দাঁতের মাজনের কথাই আমার প্রথমত মনে আসে।

আমার পরিশিষ্ট এই যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ego-কে আহত করার জন্য আমি আপনাকে এই চিঠি লিখছি না, এমন কি সমালোচক মহাশয়কেও মান্যতা জানাতে আমি বাধ্য এবং আমি তা জানাচ্ছি, যদিও তিনিই সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে, আজ, এ-রকম ভোরে, খামোকা উত্তেজিত করলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় নতুন জেনারেশনের যুবকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কবিতা লিখতে পারেননি, জীবনানন্দ দাশ পেরেছিলেন।

'যত দূরেই যাই' প্রসঙ্গে দুই প্রজন্মের কয়েকজন সমালোচকের মন্তব্য নীচে উদ্ধৃত হ'লো। জগদীশ ভট্টাচার্য মনে করেন যে,

'যত দুরেই যাই'—গ্রন্থে কবি সুভাষের তৃতীয় জন্ম। শিল্পী হিসাবে এটি তাঁর নবতর অভ্যুদয়-দিগন্তের ইশারা বহন করে এনেছে। সুভাষের কবিভাষায় গদ্য যে কখন বিশুদ্ধ পদ্যের প্রাণধর্ম লাভ করে তা যেন স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় না। ধ্বনিকারদের ভাষায় তাঁর গদ্যে পদ্যধর্মের এই অভিব্যঞ্জনা অসংলক্ষ্যক্রম। মিতভাষণ সুভাষের স্বভাবধর্ম।

'যত দূরেই যাই' গ্রন্থে তাঁর পরিশীলিত কলাকৃতি যেন চারুশীলনের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে।

এই গ্রন্থে কবিভাবনা গল্পরূপের রূপক ও রূপকথার মিশ্রশিল্প দিয়ে গড়া। তাতে ব্যক্তিচৈতন্যের সাধারণীকৃতি সহজতর হয়েছে। কিন্তু মিতভাষণে যাঁর সহজসিদ্ধি, তাঁর পক্ষে গল্পকবিতা লেখার যে বিপদ দেখা দিতে পারে, সেই বিপদ দেখা দিয়েছে কোনো-কোনো দীর্ঘ-কবিতায়। 'পা রাখার জায়গা,' 'মেজাজ' , 'ফলশ্রুতি' প্রভৃতি কবিতা রসোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অতিকথন দোষদুষ্ট।

মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত দিয়েই 'যত দূরেই যাই' গ্রন্থের আরম্ভ। প্রথম কবিতার নাম 'যেতে যেতে'। রূপকথার ভঙ্গিতে লেখা। জীবনের পথ চলতে-চলতে কবির সঙ্গে এক নদীর দেখা। পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা। পরনে উড়ু-উড়ু ঢেউয়ের নীল ঘাগরা। সেই নদীর দুদিকে দুটো মুখ।..... তারপর? তারপর গল্প শেষ করে কবি বলছেন, ' সেই রাক্ষুসীই আমাকে খেলো।' এই কবিতায় কবি বিশুদ্ধ রূপকথার ভঙ্গিটিই ফুটিয়ে তুলেছেন সন্দেহ নেই। তবু আদর্শে বিশ্বাসী আশাবাদী মানুষের এই তো জীবনসংগীত।

+

'যত দূরেই যাই'-কাব্যগ্রন্থের আরো অনেক কবিতা চলতি কালের সীমানা অনায়াসে পেরিয়ে যাবার প্রাণশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। অমনি একটি কবিতা, 'পাথরের ফুল'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে লেখা। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা 'বাইশে শ্রাবণ' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। দুটি কবিতার শিল্পরীতির মধ্যে একটা অলক্ষ্য যোগ কোথায় যেন রয়েছে। দুটিই অসামান্য কবিতা।

("সুভাষ মুখোপাধ্যায়", আমার কালের কয়েকজন কবি' , কলকাতা, ১৯৯০, পৃ ৩০৬-৭ ও ৩০৯)

সুমিতা চক্রবর্তীর মতে,

'যত দূরেই যাই' (১৯৬২) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সংকলন। ঘিরে থাকা প্রকৃতি ও পরিবেশকে দেখার চোখের অভিনবত্বে, অ-সদৃশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের প্রতিভায়, উপমা ও চিত্রকল্প নির্মাণে সুভাষ এই গ্রন্থেই অসম্ভব সার্থকতায় দেখা দেন। এবং এরপর থেকে শেষ পর্যন্তও তাঁর কবিতায় দেখা যায় এই ক্ষমতার নিরবচ্ছিন্ন সফলতা। চিত্রকল্প নির্মাণের একটিই উদাহরণ রাখছি কারণ প্রতিটি উদাহরণই একই কথা প্রমাণ করে—শিল্পীর কল্পনাপ্রবণ সৃজনশীল দৃষ্টির সৌকর্য—

গরাদের এপারে দেখো
কয়েদীর ডোরাকাটা পোশাকে
এক টুকরো রোদ
মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে
হাঁটু মুড়ে
যেন মগরেবের নমাজ পড়ছে। (বারুদের মত)

+

'যত দূরেই যাই' গ্রন্থে নৈরাশ্যবোধের কোনো প্রশয় নেই। সাধারণ ভাবেই দ্বিতীয় পর্যায়ের আধুনিক কবিরা নৈরাশ্যবোধের প্রাবল্য থেকে মুক্ত। এ-ও সাম্যবাদের আর এক শিক্ষা। ("কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়," 'আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়', কলকাতা, ১৯৯২, পৃ১৪৬ ও ১৬৭)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই পর্বের কবিতার যে-গুণটি হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবচেয়ে আকৃষ্ট করে তা হলো :

লৌকিক শব্দ, ঘটনা ও দৈনন্দিন জীবন থেকে আহৃত এইসব উপাদানে তাঁর কবিতা অনেক বেশি ইন্দ্রিয়গম্য ও মূর্ত হয়ে উঠেছে ব'লেই আমাদের উপর তার আঘাত হয় প্রবলতর। খবর-কাগজের পক্ষ থেকে এক সময়ে তাঁকে যে ঘুরে-ঘুরে বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে বার্তা ও প্রতিবেদন পাঠাতে হ'তো, এই তথ্যটি এখানে আমাদের মনে প'ড়ে যায়। 'আমার বাংলা', 'যখন যেখানে,' 'ডাকবাংলার ডায়েরি' এই বইগুলো জীবনের ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় উপস্থিতিতে তপ্ত ও স্পন্দমান। পাগল বাবরালি, সালেমন আর তার মা, ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রাম বা চড়িয়ালের রাস্তা—এই সব মানুষজন ও অনুপুঙ্খ ওই তিনটি বইকে জ্যান্ত ক'রে রেখেছে—আর কবিতায় ঘটেছে তারই সংযত স্পর্শাতুর ব্যবহার। সেইজন্যেই তাঁর কবিতা কখনো ভয়ঙ্করের, কখনো বিষাদের, কখনো সুন্দরের। অস্বাভাবিক বা বিকৃত বা আপাত তীব্র কোনো অভিজ্ঞতার তাঁর আর প্রয়োজন হয় না। তাই জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে এসে-পড়া রোদ দেখে তিনি লিখতে পারেন :

গরাদের এপারে দেখ—
কয়েদির ডোরাকাটা পোশাকে..... এখন মুরগিগুলোকে কুঁড়ো খাওয়াচ্ছে...
(বারুদের মত/ যত দূরেই যাই)

প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটির প্রতি যে অসীম মমতা থেকে তাঁর কবিতা উৎসারিত, তাই তাঁর কবিতাকে মহার্ঘ উপচারে পরিণত করেছে। সাধারণত অভিজ্ঞতা বলতে আমরা নিত্যনৈমিত্তিকের বাইরে একটা-কিছু বুঝি; কিন্তু সাধারণ বাঁচাই যে একটা মস্ত ও অফুরন্ত অভিজ্ঞতা সেটা এ-ধরনের কবিতা পড়লে বোঝা যায়, সেখানে এমনকি নেহাৎ বর্ণনাও অনুপুঙ্খের বিশেষীকরণে ও উপমার 'অন্তরঙ্গ চমৎকারিত্বে' সমৃদ্ধ।

'পদাতিক'-এর কবি যে-জনগণের কবিতা লিখতেন, তার কোনো স্পষ্ট মুখ বা আদল ছিলো না—তা ছিলো পুঁথি পড়ে জানা জনগণ, চোখে দেখা নয়। অবরুদ্ধ আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলন্ত ক্ষোভ বুকে নিয়ে তারা বিস্ফোরণের দিন গুনছিলো—সাধারণ মানবিক অনুভূতি বা দুর্বলতার মুহূর্তে কবি তাদের আমাদের সামনে এনে হাজির করেন নি। তাছাড়া কবিতার ভাষা ছিলো অত্যন্ত নাগরিক, শিক্ষিত, তির্যক ও চতুর। নাজিম হিকমতের কবিতার তরজমা করতে গিয়েই ও খবর-কাগজের পক্ষ থেকে ঘুরে-ঘুরে বার্তা সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁর চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গিতে একটি আমূল পরিবর্তন ঘ'টে গেলো। ...... তাই গোড়ার দিকে কবিতা উদ্দীপ্ত ছিলো, সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশেষ অর্থে জীবন-সমৃদ্ধ ছিলো না। কিন্তু 'ফুল ফুটুক' পর্যায় থেকে তিনি বিশেষভাবেই সাধারণ মানুষের কবি হয়ে উঠলেন। ("সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা,"

'সারস্বত প্রকাশ' দিলীপকুমার গুপ্ত অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত বর্ষ ১ সংখ্যা ৭ কার্তিক ১৩৭৫। পৃ ১২।)

কবির জবানীতে এই সময়ের অভিজ্ঞতা জানবার জন্য 'যখন যেখানে' (১৩৬৭) গ্রন্থের "বাবর আলির চোখের মত" রচনাটি দ্রষ্টব্য।

৩ কাল মধুমাস

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ভারবি ২৬ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ১২ @ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, মে ১৯৬৬
প্রচ্ছদশিল্পী: পূর্ণেন্দু পত্রী
প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায় ভারবি, ২৬ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ১২।
মুদ্রক: সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, তাপসী প্রেস, ৩০ বিধান সরণি, কলকাতা ৬।
প্রচ্ছদ মুদ্রক: নিউ প্রাইমা প্রেস, কলকাতা ১৩ দাম: সাড়ে তিন টাকা।
উৎসর্গ: আকৈশোর আমার কবিতার অক্লান্ত পাঠক রমাকৃষ্ণ মৈত্র বন্ধুবরেষু।
পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৭। ৩৮ টি কবিতার সংকলন:

১ তোমাকে বলিনি (আকাশে তুলকালাম মেঘে)
২ জলছবি (ক্যালেণ্ডারে হাত দিস্ নে)
৩ দ্বৈপায়ন (একাকিত্বের সমাহার? নাকি)
৪ নিশান (আমার স্মৃতিতে দুলে দুলে)
৫ খোলা দরজার ফ্রেমে (টেবিলের ওপর ফাটলধরা পাথরটায়)
৬ শূন্য নয় (লাবণ্য, একবার তুমি চোখ তুলে তাকালেই)
৭ এই মিছিল এই রাস্তা (ওরা ভেবেছিল আমরা রাস্তায়)
৮ ভুবনডাঙার বাউল এক (যেন উলানোভার মরালনৃত্যে)
৯ লাল গোলাপের জন্য (আমারও প্রিয় রং লাল)
১০ ছি-মন্তর (লাগ লাগ ভেল্‌কি)
১১ কুকুর ইঁদুর মাছি ফুলের গাছ (পর্দাটা উসখুস করছে)
১২ সকালের ভাবনা (দুধের গাড়িটা মোড় ঘুরতেই)
১৩ পারঘাটের ছবি (এপারে গিলে ওপারে ওগরাবে)
১৪ মর্সিয়ার পর (রাস্তায় লাইনবন্দী শোক)
১৫ কাছের লোক (দরোজা খোলো, ফিরে এসেছি)
১৬ জননী জন্মভূমি (আমি ভীষণ ভালোবাসতাম আমার মাকে)
১৭ এদিকে (ওদিকে প্রচণ্ড তর্ক)
১৮ ফোঁটা (ভাই আমাকে বকুক ঝকুক)
১৯ ভুলে যাব না (চেয়ার দোকান। তুমুল তর্কে চিড় খাচ্ছে টেবিল)
২০ কালো বেড়াল (এক গাদা লোক পুকুরে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে)
২১ আমার ছায়াটা (আগুন মুখে ক'রে)

২২ হাত বাড়ালে (কোন্ দিকে? কোথায় তুমি যাবে)
২৩ আশ্চর্য কলম (এই যে দাদা, এতদিনে বেরিয়েছে)
২৪ বন্ধু (চাঁদনিতে মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে টর্চ)
২৫ খড়ির দাগে (ওপরে আকাশ নীল ব্যথার মোচড়ে)
২৬ সাফাই (শেষ লড়াইয়ের গড়খাইগুলো)
২৭ হালুম (রাত্তিরে শেষ শো-র পর)
২৮ আমার কাজ (আমি চাই কথাগুলোকে)
২৯ এই জমি (কারো মুখের কথায় আর আমার বিশ্বাস নেই)
৩০ ফড়েদের প্রতি (আমি জানি, আমি দাবা খেলতে বসলেই)
৩১ একটি চেক কবিতার ভগ্নাংশ (মনে হবে তুমি)
৩২ সান্ধ্য (একটু আগে হাওয়ায় একটা হল্কা এসে)
৩৩ খেলা দেখে যান (মাথার ওপর খাটানো নীল)
৩৫ হেঁ হেঁ আলির ছড়া
কাণ্ড (মহকুমার সদরে ভাই)
বাঘে (চরাতে নিয়ে গিয়েছিল যে মালিক)
তিন্তিড়ী (তেঁতুলতলায় শব্দ কিসের)
৩৬ কাছে দূরে (মুখখানি যেন ভোরের শেফালি)
৩৭ রোদে দেব (আমরা বড়োরা কেন বার বার)
৩৮ কাল মধুমাস (বারবার ফিরে আসা নয়)

'কাল মধুমাস'-এর আরেকটি মুদ্রণ হয়েছিল একই সংস্থা থেকে ভাদ্র, ১৩৭৬-এ।

—প্রথম দে'জ সংস্করণ প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৮৭, এপ্রিল ১৯৮০-তে। দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৯৫, মার্চ ১৯৮৯-তে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য হলো : প্রচ্ছদ-শিল্পী গৌতম রায়। দাম পনের টাকা। প্রকাশক ঃ শ্রীসুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩।

মুদ্রাকর : শ্রীবিশ্বনাথ পাত্র, সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলকাতা ৬। প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ইমপ্রেসন হাউস, কলকাতা ৯। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৬। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চাশ বছর বয়েসে 'কাল মধুমাস' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সেকথা অলোক রায় স্মরণ করেন তাঁর "সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য" ('সাহিত্য ও সংস্কৃতি', শ্রাবণ ১৩৭৭) প্রবন্ধে :

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও অবশেষে পঞ্চাশ পার হলেন। বিশ্বাস করতে ঠিক মন চায় না। আসলে এই সঙ্গে আমাদেরও বয়স বেড়ে চলেছে। একদা 'পদাতিক'—'চিরকুট'-এর কবিকেই যেন বেশি করে চিনতুম। আজ 'যত দূরেই যাই' বা 'কাল মধুমাস' কাব্যে যে-কবিকে আবিষ্কার করি, তাঁকে কখনও মনে হয় নূতন, কিন্তু ভালোভাবে ঠাহর করে দেখলেই ধরা পড়ে, "ঘুরে ফিরে শেষে আজো সেই একই বৃত্ত।" অথচ বয়স বাড়ে,

'যৌবন বিদায় নিয়ে
এতক্ষণে পৌঁছে গেছে যেখানে যাবার।
মিষ্টি হেসে
হাত নেড়ে তাকে বলেছিলাম বিদায়।
মেয়েলি ঈর্ষায়
প্রৌঢ়ত্বও করছে যাব-যাব।'

(কাল মধুমাস)

আসলে সময়ের সংজ্ঞা বয়সের মাপকাঠি ধরে দেওয়া যায় না, "তোমার সময় দিয়ে তাই বৃথা চেষ্টা আমাকে মাপবার।" কবিকে মাপা যায় কবিতা দিয়েই, বয়স দিয়ে নয়।

১৯৩৮ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা লেখার শুরু, আর আজ ১৯৭০ সালে—এই ত্রিশ-বত্রিশ বছরের কবিতা বিচার করতে বসলে পরিবর্তনের রেখা যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি পরিণতিবোধও দৃশ্যগোচর হয়। আজও তিনি 'সকলের গান' লেখেন, লিখতে চান ; তিনি সেদিন লিখেছিলেন

'আকাশের চাঁদ দেয় বুঝি হাতছানি?
ওসব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া—
আমরা তো নই প্রজাপতি সন্ধানী,
অন্তত, আজ মাড়াই না তার ছায়া।

আজ লেখেন,

'আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।
আমি যেন আমার কলমটা
ট্র্যাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি—
এই আমার ছুটি
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।

('আমার কাজ,' "কাল মধুমাস")

আমি আপাতত সাদৃশ্যটুকুর উপরই বেশি জোর দেব। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বত্রিশ বছর আগে বাংলা কাব্যে যে একটি নূতন সুর সংযোজন করেছিলেন, সেদিন নূতন বলেই তার যে-চমক ছিল, আজ আর তা নেই। কিন্তু কবির কাব্য "বার বার ফিরে আসা নয়। পারাপার / নয়। / শুধু যাওয়া।" সুভাষ মুখোপাধ্যায় একদা ছিলেন বাংলা কাব্যের বিস্ময়—প্রসঙ্গ এবং প্রকরণ উভয় ক্ষেত্রে। কিন্তু এখন বিস্ময়ের চমৎকারিত্ব চলে গেছে বলেই তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে একধরনের চমক অনুভব করি—অপ্রত্যাশিতের চমৎকারিত্ব। পঞ্চাশোত্তীর্ণ প্রায়-বৃদ্ধ কবি বলে তাঁকে ভাবতে পারি না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঘরের কোণে ফিরে যাননি, কৈশোরের সেই যাত্রা আজও অব্যাহত। সেই জন্যই ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না, তাঁরও বয়স হয়েছে তিনিও বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লে যেমন বয়সের কথা মনেই পড়ে না। তেমনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। কবি মাত্রেই পদাতিক, তিনি অগ্রসর হবেন। রণছোড় হওয়ার উপায় নেই তাঁর। (পৃ ৩০৪-৫)

+

আজকের দিনে রাজনীতির সঙ্গে কবিতার, কবিতার সঙ্গে জীবনের নিবিড় অন্তর্নিবিষ্ট সম্পর্ক নিয়ে আমাদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না। 'রাজনৈতিক কবিতা' বলে কোনো আজব জিনিস নেই, সুতরাং রাজনীতির সঙ্গে কবিতার বিরোধ কল্পনাও নিরর্থক। সুভাষ

মুখোপাধ্যায় রাজনীতিকে গ্রহণ করেছেন সেই ব্যাপকতম অর্থেই, যেখানে রাজনীতির মধ্যে বৃহত্তর ইতিহাস-নীতিও যুক্ত, আর ইতিহাসকে অস্বীকার করার অর্থ নিজেকেই অস্বীকার করা। তবু ভুল বোঝা হয়, ভুল বোঝানো হয়,—আসলে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতকে রাজনীতি ব'লে ভুল করলেই এই বিপর্যয় ঘটে।.... আমরা আগেই দেখেছি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ইতিহাসবোধের প্রকাশ, যা—সম্প্রতি প্রকাশিত 'কাল মধুমাস' গ্রন্থেও আবার শুনি, "কালের সেপাই এসে ঘাড় ধরে তুলে দিয়ে বলল—হট্।" কাল মধুমাস এই প্রত্যয়ই কবিতার রাজনীতি এবং এই রাজনীতিই কবিতার প্রাণ। (পৃ ৩০৭)।

অরুণ সেন 'কাল মধুমাস' কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় লেখেন :

চল্লিশের কবিদের মধ্যে আমাকে সব চেয়ে টানে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং মণীন্দ্র রায়ের কবিতা। মণীন্দ্র রায়ের 'কালের নিস্বন' গত বছর বেরিয়েছে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাল মধুমাস' এ-বছর জ্যৈষ্ঠে। দুজনকেই এখন সময়কে নিয়ে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে।

+

বুদ্ধদেব বসু একদা বলেছিলেন, সুভাষ নাকি সমর সেনের রোমাণ্টিক সৌন্দর্যের জন্য হাহাকারকে বিষাদেরও অযোগ্য বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই হাহাকার নেই, কিন্তু বিষাদ যেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকেও এখন আক্রমণ করেছে। বিষাদ, স্মৃতি ইত্যাদি তো তাঁর কবিতায় সত্যিই এক সময়ে অভাবিত ছিল এবং পুরোপুরি সুখেরও ছিল না সেটা।

আমার ভালো লাগে সেই কবিতাও, যেখানে তিনি সচেতনভাবে একটি সুরকে অনুরণিত করে করে একটি অসাধারণ এফেক্ট তৈরি করেন :

'আমার স্মৃতিতে দুলে দুলে
দুলে দুলে

সারাক্ষণ
দুলে দুলে
নিশান
দুলে দুলে
নিশান
দুলে দুলে
সারাক্ষণ আমার স্মৃতিতে
নাচছে।'

কিংবা 'দরোজা খোলা / ফিরে এসেছি—/ফিরে এসেছি দেখ' জাতীয় কিছু কবিতা। 'কাল মধুমাস' কবিতায় দেখছি, কখনো লোক-দেখানো মিল, কখনো খুব চোরা-মিল, যেন মিলই নয়, অদ্ভুত মেজাজ তৈরি করেছে। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়, মনে হয়, সম্প্রতি বিষয়বস্তুর অভাবে সমস্যা দেখা দিচ্ছে—তাই নিজেকে অনুকরণ করারও ঝোঁক এসে পড়ছে, যা অন্তত তাঁর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত ছিল।

("পরিবর্জনে, নয় পরিগ্রহণে," 'পরিচয়', গোপাল হালদার সম্পাদিত বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ৯-১০ চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৩-৭৭ পৃ ৮৬৫, ৮৬৭)।

'কাল মধুমাস'-এর অন্তর্গত "সাফাই" কবিতাটির বিশ্লেষণ করেছিলেন মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকার (অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত) একাদশ সংখ্যায়।

৪. **এই ভাই** সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলিকাতা ৯। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৮, সেপ্টেম্বর ১৯৭১। প্রচ্ছদশিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী। প্রকাশক ব্রজকিশোর মণ্ডল। বিশ্ববাণী প্রকাশনী ৭৯/১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৯। মুদ্রক মানসী গুহঠাকুরতা। শাশ্বতী প্রেস ৯/৩ রমাকান্ত মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯। দাম চার টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। ৪১টি কবিতার সংকলন :

১ পূর্বপক্ষ
২ উত্তরপক্ষ
৩ সামনের স্টপে
৪ পাখির চোখ
৫ গাও হো
৬ ভাবতে পারছি না
৭ ল্যাং
৮ দূরত্বে
৯ এ ও তা
১০ বলিহারি
১১ দুয়ো
১২ বাঘবন্দী
১৩ বাইরে থেকে ভেতরে
১৪ ছুটির গান
১৫ ছাই
১৬ কে যায়
১৭ জল আসুক
১৮ এই ভাই
১৯ এক অস্থির চিত্র
২০ এইও
২১ তাঁর ইচ্ছেয়
২২ খেলা
২৩ এমনি ক'রে
২৪ একাকার
২৫ জেলখানার গল্প
২৬ ভাল লাগছে না
২৭ সুখে থাকো
২৮ ছিন্নভিন্ন ছায়া
২৯ আমাদের হাতে
৩০ হতেই হবে
৩১ নজরুল তোমাকে
৩২ পটলডাঙার পাঁচালী যাঁর
৩৩ যা চাই
৩৪ নাটক
৩৫ সর্ষে
৩৬ ছত্রী
৩৭ পুপের নয়
৩৮ সিনেমামা
৩৯ পুপের মা-র গল্প
৪০ তানসেন গুলি
৪১ রোমাঞ্চ সিরিজ

বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরিয়েছিল কিনা জানি না। 'এই ভাই' পরে 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ'-র দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি সংযোজিত হয়েছে :

১ বাড়িয়ে বাড়িয়ে (পা বাড়ালেই)
২ দেখ মাস্টের (সাদা। কালো কালো। সাদা)
৩ শুধু আজ ব'লে নয় (শুধু আজ ব'লে নয়)
৪ জলদি জলদি (জলদি জলদি)

৫ ভালবাসার মুখ (আমার যাওয়া)
৬ তোমাকে দরকার
(তোমাকে আমার এখন
খুব দরকার)
৭ চীরবাসে (কবিতাকে পারি
আমিও পরাতে পোশাক)
৮ পাহাড়ে গা তোলে গোলাপ
(পাহাড়ে গা তোলে গোলাপের
মঞ্জরী।)

—দে'জ সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

এই গ্রন্থটি প্রসঙ্গে 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন' (পরে গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য) -এর সম্পাদক জমিল শরাফী (রণেশ দাশগুপ্ত) লেখেন :

ষাটের দশকের শেষ এবং সত্তর দশকের শুরুতে লেখা। গণ-বৈপ্লবিক শিবিরের আভ্যন্তরীণ ভ্রাতৃঘাতী, আত্মঘাতী-আত্মহত্যা প্রবণতার বিভ্রান্তিকে কাটিয়ে ওঠার সংগ্রামের পটভূমিতে লেখা

"আমরা এ ওকে
সে তাকে
নখ দিয়ে খুঁড়ছি
দিনরাত খুঁড়ছি
দিনরাত খুঁড়ছি
রাতদিন খুঁড়ছি।"

৫ ছেলে গেছে বনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ৯। প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২। ষষ্ঠ মুদ্রণ জানুয়ারী ১৯৮৭। প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী। আনন্দ প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি স্কীম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। মূল্য ৮.০০। উৎসর্গ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বাংলাভাষী ও ভারতের বহুভাষাভাষী বীর সৈনিকদের উদ্দেশে। পৃ ৫৫। মূল শিরোনাম ধরলে চল্লিশটি কবিতার সংকলন।

১ সামনেওয়ালা ভাগো
২ অদ্ভুত সময়
৩ হাত বাড়িয়ে রেখেছি
৪ ছেলে গেছে বনে
৫ সফরী
৬ খেলা হবে
৭ মধ্যে যুদ্ধ
৮ লাগসই
৯ নমুই
১০ ধরাবাঁধা
১১ চর্যাপদ থেকে
১২ শহিদুল্লা এর দুটি কবিতা
১৩ ৎভারদভ্স্কির একটি কবিতা
১৪ বসন্ত দর্শন
১৫ গাঁয়ে ফিরে
১৬ পাথরকুচির গান
১৭ প্রেমগীতি
১৮ হতাম যদি হাওয়া
১৯ হতাম যদি গোলাপ
২০ শরতের দিন
২১ যৌবন [illegible]
২২ দূরভাষ
২৩ খাঁচা-ছাড়া
২৪ নিশির ডাক নাটকের গান
২৫ বায়নাক্কা
২৬ ম্যাও

২৭ ভিয়েতনামে শোনা একটি গান
২৮ দেখেশুনে
২৯ দেওয়ালে লেখবার জন্য
৩০ কে বা কারা
৩১ নিয়ে যাব শহর দেখাতে
৩২ সময়ের জালে
৩৩ ফেরাই
সবাই সমান
বলির বাজনা
মধ্যিখানে চর
বন্ধুরা কোথায়
৩৪ একুশে ফেব্রুয়ারি
৩৫ দ্রুতি
৩৬ শব্দে আর নিঃশব্দে
৩৭ আজকের গান
৩৮ আলোয় অনালোয়
৩৯ কড়াপাক
৪০ পূব হাওয়ার গান

কাব্যগ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ দেখতে না পাওয়ায় পরিবর্তন অথবা সংযোজন বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না। জমিল শরাফী 'ছেলে গেছে বনে' বিষয়ে মন্তব্য করেছেন :

> বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন কবির মনে নতুন আশার বাতি জ্বেলেছে, তখন এখানে-সেখানে ছড়িয়ে থাকা সাথীদের ফিরে পাবার জন্যে গভীর অপেক্ষা ও আগ্রহ নিয়ে লেখা এই কবিতাগুলি। উপরোক্ত পর্বগুলির সামগ্রিক এবং ঐকিক পটভূমিতে রেখে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত কবিতাকে ধারাবাহিকভাবে অথবা যখন-যেটা-ইচ্ছা নিয়ে মনের মধ্যে রাখলে একটা কথা নিশ্চয় কাঁটার মতো বিঁধবে। সেটা হচ্ছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার রাজনৈতিকতা। এটাকে চাপা দিয়ে সুভায মুখোপাধ্যায়ের কবিতার স্বাদ পাবার যে কোন রকম বিমূর্ত চেষ্টা নখ তুলে দিয়ে সুন্দর হাতকে নরম করার চেষ্টা মাত্র।....মুক্তি সংগ্রাম ও সাম্যবাদের রাজনীতি করলে যে কবিতার সারসত্তাব গভীরতা বাড়ে এবং কবিতার জাত না গিয়ে তার মান বাড়ে, এই ধারাটির একজন প্রধান প্রতিভূ সুভাষ মুখোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা কবিতায়। নাজিম হিকমতের কবিতার যে অনুবাদ করেছেন সুভায মুখোপাধ্যায়, তার তীক্ষ্ণতীব্রতায় রয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিসঙ্গ বেছে নেবার ব্যাপারে সুস্পষ্টতা। কিন্তু বিপ্লবী কবিতা আর রাজনৈতিক বিপ্লবী প্রতিবেদন দু'টো রচনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ব্যাপার। সুভাষ কবি। রাজনৈতিক কবি।

বাংলাদেশ সংস্করণ

৬ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন

বৈশাখ, ১৩৮২ এপ্রিল, ১৯৭৫। প্রকাশক ও মুদ্রক ওয়াদুদুল হক। লালন প্রকাশনী ২৬২ বংশাল রোড ঢাকা-১। প্রচ্ছদপট কাইয়ুম চৌধুরী। লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। দাম পঁচিশ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭৯।

'পদাতিক' থেকে 'ছেলে গেছে বনে' এই আটটি মৌলিক কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত

সংকলন। মোট ১২২টি কবিতা আছে। 'কবির কথা' শীর্ষক ভূমিকায় বলা হয়েছে :

এ, খল, খতিব আমার অনেক দিনের বন্ধু। জন্মসূত্রে বাঙালী না হয়েও বাংলা ভাষা আর বাংলাদেশের ওপর তাঁর মত এমন নাড়ীর টান খুব কম দেখা যায়। লালন প্রকাশনীকে দিয়ে বাংলাদেশে আমার এই বই প্রকাশ করানোর মূলে রয়েছেন আমার সেই অকৃত্রিম বন্ধু খতিব।

সহৃদয় প্রকাশক ওয়াদুদুল হক সাহেব আমাকে বিপদে ফেলেছেন এ বইয়ের একটা ভূমিকা লিখে দিতে ব'লে। একে নিজের লেখা, তার উপর কবিতার বই। অগত্যা প্রকাশকের কথা রাখতে গিয়ে আমাকে সেই কথাই বলতে হবে যার সঙ্গে কবিতার তেমন কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই।

চার দশক ধরে যা লিখেছি, তা থেকে বাছাই করে এ বইতে ধ'রে দেওয়া হয়েছে। বাছাইয়ের মাপকাঠি সময় বা বিষয়—একান্তভাবে কোনোটাই নয়। তবু নানা সময় এবং নানা বিষয় এই বইতে স্থান পেয়েছে। যাতে কিছুটা বৈচিত্র ফুটে ওঠে।

এ বই বাংলাদেশে এই প্রথম প্রকাশিত হওয়ায় এমন অনেক পাঠক-পাঠিকার কাছে আমার কবিতা পৌঁছুবে—যাঁবা হয়ত এই প্রথম আমার কবিতা পড়বেন। স্থান-কালের দূরত্বে কার মনে কেমন ছাপ পড়বে জানি না। সব কবিতারই উৎস তার সমকাল আর জনজীবন। আশা করি, পাঠকেরা তা স্মরণে রাখবেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা
৬ই আগস্ট, ১৯৭৪

এই সঙ্গে সংযোজিত ঢাকা ২৬শে মার্চ, ১৯৭৫ তারিখ স্বাক্ষরিত জমিল শরাফীর ৭ থেকে ১২ পৃষ্ঠার 'কবি পরিচিতি'। এখান থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে অন্যত্র। জমিল শরাফী আসলে রণেশ দাশগুপ্তর ছদ্মনাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন যে, 'ঢাকার লালন প্রকাশনীর সুভাষ কাব্য সংকলন বইটি আপনি পেয়েছেন, এই সুসংবাদটি পেলাম। এতে সম্পাদক হিসেবে ভূমিকাটি লিখেছিলাম ছদ্মনামে। সেই সময়ে জমিল শরাফী নাম নিয়ে সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে লিখতাম (৭. ১১ ৯২)'। নীচে এই নির্বাচিত কাব্যগ্রন্থের সূচি দেওয়া হ'লো :

পদাতিক

কাল মধুমাস

এই ভাই

ছেলে গেছে বনে

পাঠভেদ

এই পর্বের কবিতাগুলিতে পাঠভেদ প্রায় নেই বললেই চলে। তবুও প্রথমের সঙ্গে পরবর্তী সংস্করণের যে দু-একটি শব্দেব পার্থক্য দেখা যায়, তা নীচে নির্দেশিত হ'লো। তবে বিরতিচিহ্ন, অণুচ্ছেদ এবং পঙক্তি-বিন্যাসের বদল দেখানো হয়নি। আর যেগুলি স্পষ্টতই ছাপার ভুল (যেমন 'দিন আসবে' কাব্যগ্রন্থের "একটি চিঠি"র পঞ্চম স্তবকে 'মৃদুমন্দ হাওয়ার প্রতি' ছাপা হয়েছিল '...... হওয়ার প্রতি' অথবা 'এই ভাই'-এর দ্বিতীয় স্তবকে 'আমার মানা / আর না মানার মাঝখানে' ছাপা হয়েছিল 'আমার মামা / আর না মামার মাঝখানে'), সেগুলি বর্জিত হয়েছে।

যত দূরেই যাই

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা	স্তবক	পঙক্তি	ছিলো	হয়
রাস্তার লোক	৮৩	৬	১	তাব মনে হল	তাবপব মনে হল
আলো থেকে অন্ধকারে	৯৩	৫	১-৬	সমস্ত সভ্যতা ভুলে	যেখানে সভ্যতা ভুলে
				. .... .	
				যেখানে হিংস্র অন্ধকাব	হিংস্র অন্ধকার
দূব থেকে দেখো	১০৩	১	২	চামচে কবে নাডাতে থাকব	...নাডতে..

কাল মধুমাস

একটি পোলিশ কবিতার ভগ্নাংশে

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা	স্তবক	পঙক্তি	ছিলো	হয়
	১৪৩	শিরোনাম		একটি চেক কবিতাব ভগ্নাংশে	.পোলিশ..
কাল মধুমাস	১৫২	৫ (অণুচ্ছেদ)	৩	দাঁতে দাঁত কডমড কডমড়	দাঁতে দাঁতে..

দিন আসবে

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা	স্তবক	পঙক্তি	ছিলো
একটি চিঠি	৩৪	৪	৪	সেই কোন্ দূরে-র পর এই

পঙক্তিগুলো ছিলো : [পরে বর্জিত।]
শূণ্যগর্ভ (sic) হতাশার নিষ্ঠুর জাল।
আর বক্তের মধ্যে বুকে হেঁটে চলল
তার পাকিয়ে ওঠা ভয়।
কবিতার সেই কোন্ কবিতার কথা সেসব
তখনও
মাথার উপর চাঁদের হাট বসিয়ে
[illegible] হাওয়ায় ভাসত [illegible] দল।
তখনও স্ফটিকের মত
ঝলমলে ছিল আকাশ
আর শূণ্যতা (sic) ছিল সীমাহীন নীল।
সন্ধে নাগাদ দিগন্তে বিলীন হত শুভ্র পাল

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা	স্তবক	পঙক্তি	ছিলো	হয়
				আর মাস্তুলগুলো মিলিয়ে যেত কোথায় সেই কোন্ দূরে	
গ্রামবার্তা	৩৭	৪	৪	এখন শুধু হুকুমের অপেক্ষা	....ওয়াস্তা
মানব-বন্দনা	৩৯	৬	৪	কিছু লুকানো টাকা	কিছু লুকোনো...
	৪০	১৭	৩	স্নান করেছে একটি নক্ষত্র	.... করছে ....।
	৪১	২৭	২	আপনি এমনভাবে সব বলছেন	....বলেছেন
স্পেন	৪৯	৭	১	টোলেডোর রাস্তায় রাস্তায়	তোলেদোর...
	৫০	৬	৭	তুমি শান্তিতে ঘুমোও	
দ্বৈরথ	৫১	৪	১১-১৫	স্তবকে স্তবকে কয়লা ভেঙে চাপা পড়ল পনেরোটা মানুষ পনেরো জন মানুষের জীবন্ত কবর।	.... পনেরো জন জীবন্ত কবর।
দিন আসবে	৫৬	৮	৩-৪	বুলেট ওড়াবে?	বুলেটে ওড়াবে?
স্মৃতি	৫৯	২	১-২	দোষ তার একটাই .... কাশত	দোষ তার একটাই ছিল শুধু কাশত।
	৫৯	২	১- ২	দোষ তার একটাই কাশত	দোষ তার একটাই ছিল শুধু কাশত [এই দুই ফুটকিচিহ্ন সম্পাদকের নয়]
এই ভাই					
ছাই	১৭৯	১১	৩	কিচ্ছুতেই কিছু হয় না	কিছুতেই......
এক অস্থির চিত্র	১৮৭			এক অস্থায়ী চিত্র [শিরোনাম]	
ছেলে গেছে বনে					
সময়ের জালে	২৪৬	৪	২	দুপাশের দেয়ালে আল্‌সে ছাদে.....	.... আল্‌সেয়.....

সংযোজন

কাল মধুমাস কাব্যগ্রন্থের 'একটি পোলিশ কবিতার ভগ্নাংশ' (ক.স.২, পৃ. ১৪৩) 'ভারবি' প্রকাশিত *কাল মধুমাস* গ্রন্থে 'একটি চেক কবিতার ভগ্নাংশ' নামেই ছাপা হয়েছিল। গ্রন্থ পরিচয় অংশে মূল গ্রন্থের সূচি অপরিবর্তিত রাখা হল। যদিও কবিতাটি অবশ্যই পোলিশ।

এই ভাই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত 'যা চাই' কবিতাটি (কবিতা সংগ্রহ ২, পৃ ২০১) আর *ছেলে গেছে বনে* কাব্যগ্রন্থের 'দূরভাষ' কবিতাটি (কবিতা সংগ্রহ ২, পৃ ২৩৭) মূলত একই কবিতা। যদিও দুটি ভিন্ন কাব্যগ্রন্থে দু-ভাবে কবিতাটি সাজানো আছে। স্বাভাবিক কারণেই যতিচিহ্নেও ভিন্নতা আছে। বিন্যাস ও যতিচিহ্ন ছাড়া লক্ষ করার মতো দুটি পরিবর্তনের কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। 'দূরভাষ' কবিতাটির (পৃ ২৩৭) পঞ্চম পঙ্ক্তিতে 'জেনে রেখো' শব্দ দুটি যোগ হয়েছে আর একাদশ পঙ্ক্তিতে 'আমি' শব্দটি বর্জিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সংস্করণের মতো *কবিতা সংগ্রহ* ২-এর এই সংস্করণেও দুটি কবিতাই থাকল।